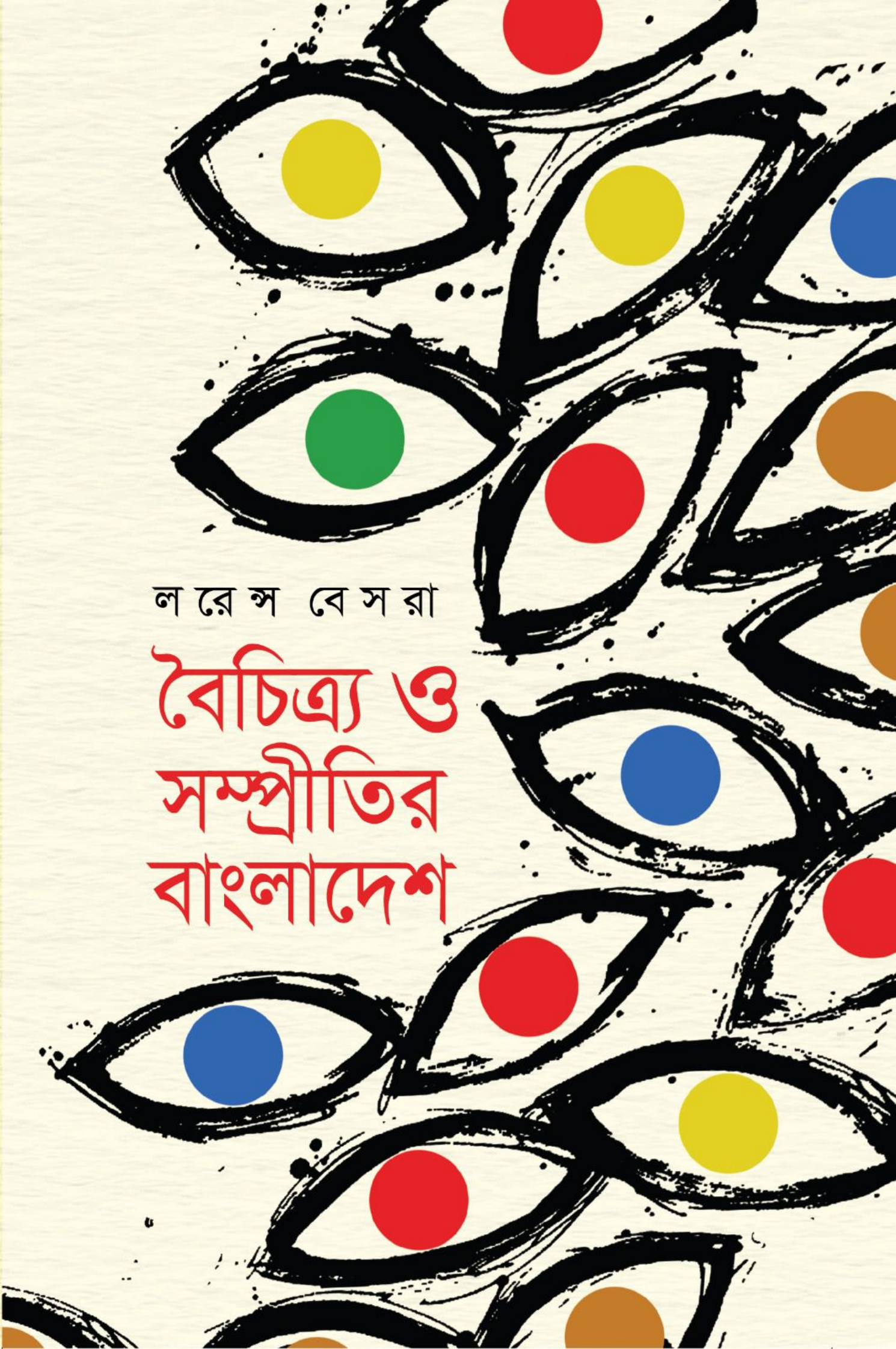

লরেন্স বেসরা

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর)-এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপ্স হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতাস এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি লাভ করেন এবং Flinders University of South Australia থেকে Masters of Policy and Administration ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১০-২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়ে Flinders University of South Australia থেকে Public Policy and Management এর উপর PhD ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্রাক ও সুপ্র সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থায় দক্ষতার সাথে কাজ করেন এবং অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার কানেকটিকাট রাজ্য সরকারের সমাজ সেবা বিভাগে কর্মরত আছেন।

Boichitro O Shompritir Bangladesh
by Lawrence Besra
Price : 350/- US: $ 20
ISBN : 978-984-8054-36-9

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ • লরেন্স বেসরা

লরেন্স বেসরা

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ■ চারু পিন্টু

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ ২

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

ড. লরেন্স বেসরা

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ
ড. লরেন্স বেসরা
স্ব: লেখক

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজেদুল হাসান

জয়তী
৬৮ কনকর্ড এম্পোরিয়াম, ২৫৩-২৫৪
কুদরাত-ই-খুদা রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০২৪৪৬১৭৯০০, ০১৬১৩২৭১৬৪৬

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী-২০২৫

প্রচ্ছদ: চারু পিন্টু

যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়কারী
428, West Middle Turnpike, Apartment-56 U
Manchester, CT- 06040, USA,Cell: +1 860-890-5991
E-mail: besralawrence75@gmail.com

মুদ্রণ
বগুড়া প্রিন্টার্স
১৯, বাবুপুড়া, কাঁটাবন, নিউ মার্কেট, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ।

মূল্য: ৩৫০ টাকা

Boichitro O Shompritir Bangladesh by Lawrence Besra February 2025,
Published by Mazedul Hasan,
Joyotee, 68 Concord Emporium, 253-254 Kudrat-E-Khuda Road,
Kantabon, Dhaka-1205.
joyoteenews@gamil.com, www.joyoteebd.com

Price: 350 Taka USA $ 20

ISBN : 978-984-8054-36-9

উৎসর্গ

আমার সর্বস্তরের শিক্ষকবৃন্দ যারা আমাকে আমার মাতৃভাষা সান্তালি, বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালার সাথে পরিচয় করে দিয়েছেন। অনেকেই সুতোর ওপারে পাড়ি দিয়েছেন এবং অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। মহান সৃষ্টিকর্তা ও পিতা মাতার পরেই আমার পরম পূজনীয় শিক্ষকবৃন্দ যারা আমার দুর্দিনে আমার পাশে ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁরাই আমার মুক্ত বুদ্ধির চর্চা ও চিন্তা চেতনার দ্বার প্রসারিত করেছেন এবং সত্য ও সুপথে নির্ভয়ে পথ চলার সাহস ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তাঁরাই আমার নিরাকার ঈশ্বরের জ্ঞানের আকার। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর বেঁচে থাকেন ভক্তের হৃদয়ে। তাঁদের চরণতলে আমার এই ক্ষুদ্র শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রকাশনা পৃষ্ঠপোষকতা

এই প্রকাশনার পিছনে সকল অনুপ্রেরণা ও আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা করেছে আমার বাবা ও মা'র স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠান যা অসহায়, আদিবাসী ও দুস্থদের মাঝে নানাবিধ সামাজিক সহায়তার জন্য বদ্ধপরিকর।

মাদার কলম্বা ও রিবেনিউশ ফাউন্ডেশন

হাজিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা

মহান সৃষ্টিকর্তার পরেই আমার পরলোকগত পিতা ও মাতা এবং আমার সর্বস্তরের শিক্ষকবৃন্দ যারা আমাকে লালন-পালন ও শিক্ষাদান করেছেন তাঁদেরকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সেই সাথে আমার পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে স্মরণ করছি বিশেষ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমার বড় ভাই ডমিনিক বেসরা-কে যিনি আমাকে ছোটবেলা থেকেই পড়ালেখার উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ইংরেজি বিভাগের সহপাঠীগণ বিশেষ করে আমার বন্ধু বিধান চৌধুরী ও নীলমণি আইচ আমাকে প্রকাশনার জন্য সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এই মুহূর্তে স্মরণ করছি অকাল প্রয়াত আমার সহপাঠী ও বন্ধু বিকাশ সিংহ সুত্রধর-কে যে আমার বেহিসেবি জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য সবসময় তাগাদা দিতো। আরও স্মরণ করছি আমার সহপাঠী ও বন্ধু কবি সাম্য সাথী ভৌমিক-কে যে আমার প্রেরণার নিরন্ত উৎস হিসাবে কাজ করেছে। আমি তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করছি।

আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী তৃপ্তি কারমেল সরেন ও আমার একমাত্র মেয়ে এথিনা কলম্বা বেসরা-কে যে আমার সব সব লেখাগুলোই পড়তো। তাঁদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই প্রকাশনার কাজ হয়তো কখনই সম্ভব হতোনা।

আরও ধন্যবাদ জানাই জয়তি প্রকাশনীর কর্ণধার মাজেদুল হাসান পায়েল সহ সকল কলাকুশলীদেরকে যারা দিন রাত পরিশ্রম করে সুলভে এই প্রকাশনীর জন্য অবদান রেখেছেন।

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ শিরোনামের এই বইয়ের সব লেখাগুলোই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যা এখানে সংকলন হিসাবে প্রকাশনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অনেক যত্ন ও চেষ্টার পরেও হয়তো এই বইয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে তাই পাঠক ও সকল শুভানুধ্যায়ীদের নিকট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

সূচিপত্র

জেগে থাকি স্বপ্ন দেখার আশায় ১১
অস্ট্রেলিয়ার দাবানল ১৪
আদিবাসী দিবস উদযাপন :
কাঠামোগত বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসানের
কথা কেউ বলে না ১৬
চেনা মুখ পাবে ত্রাণ আর সংখ্যালঘুর যাবে প্রাণ ২২
চেক পয়েন্ট বাংলাদেশেই–বিদেশে
প্রতিবাদ করে কী হবে? ২৫
মায়ের ভাষা বিনে মেটে কি মনের আশা? ২৮
চাই আইন ও সংবিধানের
প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন ৩১
লাখো প্রাণের বিনিময়ে যেভাবে আমরা বাংলাদেশের
স্বাধীনতা ও বিজয়ের লাল-সবুজের পতাকা পেলাম ৩৩
প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্য রাগে ৪০
ফাল্গুন এবং বসন্ত বরণে ঝুমুর গান ৪৩
জীবনের নবায়নে এই বসন্তে নানান রঙের উৎসব ৫০
বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলা নববর্ষের চেতনার অনুরণন ৫৬
'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটির সুর নয়
বরং চেতনা ও অনুপ্রেরণার কথাই বলি ৬১
রূপান্তরিত পৃথিবীর শিশু কবিতার
ইংরেজি অনুবাদ : আমার মন্তব্য ৬৩
'জলজ' কবিতার একটি পর্যবেক্ষণ ৬৫

কবিতার অসুখ হলে পাঠকের কী হবে? ৬৮
আমাদের হৃৎপিণ্ডের অদৃশ্যমান শত্রুকে
বধ করব কীভাবে? ৭৩
যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনির মিল ও অমিল ৭৭
ত্রিরত্নের ত্রিমূর্তি : শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশু ৮০
গল্প হলেও সত্যি ৮৪
ঈশ্বর বেঁচে থাকেন ভক্তের হৃদয়ে ৯১
স্মৃতির পাতায় অম্লান সাইফুদ্দিন সবুজ ভাই ৯৩
ওপারে ভালো থাকবেন রবিন দা ৯৫
পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহার :
ইতিহাস সব সময় বিজয়ীর কথা বলে, পরাজিতের নয় ৯৭
মরুর বুকে আরব বিশ্বে সংখ্যালঘু জনগণ ১০০
বাইবেলের দুধ ও মধুর দেশে আজ সংঘাত ও প্রাণহানি ১০৩
মায়াবী মহুয়ার মাদকতাময় জীবনের ছন্দপতন ১০৬
প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে
লুকিয়ে আছে বেদনার নীল কাব্য ১০৯

জেগে থাকি স্বপ্ন দেখার আশায়

অনেক দিন আগে গল্পটা কোথায় যেন পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। কোনো এক রাজ্যের প্রজারা তীব্র আর্তনাদ ও হাহাকার করছে। একদিকে খরা, অনাহার ও দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে চারিদিকে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ও মহামারি। আরও বড় বিষয় হলো যে, ওই রাজ্যের রাজা আর কোনো স্বপ্ন দেখতে পারছিলেন না। এ নিয়ে রাজ্যের সব জনগণের উদ্বেগ ও আশংকা সীমাহীন।

আমরা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। কোনোটা আকাশ ছোঁয়া, কোনোটা সাধ ও সাধ্যের বাইরে লাগামহীন, আবার কোনোটা রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। কথায় আছে, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে বাধা কোথায়! প্রয়াত আবদুল কালাম সাহেব বলেছেন, ঘুমের ঘোরে রাতে আমরা যে স্বপ্ন দেখি, আসলে তা স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন হলো সেটা যা আসলেই মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করি সত্যিই তো তাই। আসলে স্বপ্নই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আশার তরীতে উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেয়ার সাহস জোগায় এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য নিরন্তর তাড়না ও প্রেরণা দেয়।

আজ যে স্বপ্নদ্রষ্টার কথা বলছি, তিনি একজন কৃষ্ণ বর্ণের মহান লোক। সারা আমেরিকা জুড়ে আজ স্কুল ছুটি, তার স্মরণে অসংখ্য সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় দুই শতক ধরে দৃশ্যমান দেয়ালে বিভাজিত ছিল কৃষ্ণ গহ্বরের লোকজন। ১৯৬৩ সালে আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশাল এক জনসমুদ্রে তিনি তাঁর স্বপ্নের বয়ান দেন। 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' শিরোনামে তিনি সাম্য, মৈত্রী ও বৈষম্যহীন স্বপ্নের দেশ গড়ার অহিংস আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে ঘুরে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বপ্নের জাল বুনে মানুষকে সংগঠিত করেছেন। নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত জনগণ প্রতেকেই তাঁর স্বপ্নকে নিজের স্বপ্ন হিসেবে লালন ও ধারণ করেন। অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের ফলে কৃষ্ণবর্ণের লোকজন ১৯৬৫ সমান অধিকার ও ভোটের অধিকার লাভ করে। এই ঐতিহাসিক

আন্দোলনের নেতা মারটিন লুথার কিং ১৯৬৪ শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে এক অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হওয়ার পরেও তাঁর স্বপ্নগুলো আমেরিকাকে একটি উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সমৃদ্ধি লাভ করতে সহায়তা করেছে।

আমেরিকাসহ উন্নত দেশে আজও মানুষের ধর্ম ও গাত্র বর্ণ নিয়ে প্রকাশ্যে সচরাচর কেউ কটূক্তি করে না। স্কুল ও পরিবার থেকেই বাচ্চাদের এ নিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা প্রদান করা হয়। অথচ আমাদের বাংলাদেশে কোমলমতি শিশুদের এইসব শিক্ষা দেয়ার আগেই স্কুল ব্যাগের ওজনের ভারে তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে কুঁজো করে দেয়ার প্রবণতা প্রচলিত রয়েছে। সে জন্যই বুঝি, স্কুলের পাঠ্য পুস্তক রচয়িতাদের সৃজনশীলতার সুবাদে ছাগল গাছেও উঠতে বাধ্য হয়। রক্ষণশীল বাংলাদেশে মেয়েরা জিন্স ও টি-শার্ট পরলে কেমন যেন সবাই সহজে মেনে নিতে পারে না। আবার তারাই স্কুল ও কলেজে মেয়েদের ওড়না পরতে নিষেধ করে, যা বাংলাদেশের মেয়েদের দীর্ঘদিনের পোশাক ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য। অন্যদিকে আবারও তথাকথিত সৃজনশীল পাঠ্য পুস্তক রচয়িতারা লেখেন যে, মেয়েরা বয়ঃসন্ধিকালে বুক নিচু করে সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটে। এ যেন ঠিক কয়েক দশক আগের পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত 'কপাল ভিজিয়া গেল নয়নের জলে' কিংবা 'হাটটি মাটিম টিম–তারা মাঠে পাড়ে ডিম' জাতীয় অলীক ঘোড়ার ডিম মার্কা বই-পত্র। এই সব থেকে বাংলদেশের শিশুরা কী শিখে বড় হবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না। আজকের জিপিএ-৫ ভিত্তিক ও মুখস্থ-নির্ভর শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে কিছু দিন আগে খবরের কাগজে একটা ভালো সংবাদ পড়েছিলাম। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, বর্তমানে স্কুল ও কলেজে যে শিক্ষা দেয়া হয় তা বাস্তব জীবনে কোনো কাজে আসছে না। মন্ত্রী মহোদয়ার এমন আত্ম-উপলব্ধি এবং সু-মতামত আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। কারণ আত্ম-উপলব্ধি মানুষের মধ্যে স্বপ্ন ও কল্পনার জগৎ তৈরি করে এবং সঠিক কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়িত হলে আমার মতো অনেকেরই স্বপ্ন পূরণ হবে বলে আশা করি।

আমরা স্বপ্ন দেখতে চাইলেও আমাদের স্বপ্ন দেখার পরিবেশ দিন দিন কলুষিত হয়ে আসছে। একদিকে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে ভেজাল ও বিষ, জিনিসপত্রের ঊর্ধ্বগতি মূল্য, পরিবেশ দূষণ ও সীমাহীন দুর্নীতি আমাদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ফলে আমরা চাইলেও

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আর কোনো স্বপ্ন দেখতে পারবে না। মাঝেমধ্যে ভেজাল ও দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চলে কিন্তু তাও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর কারণে উন্নয়নের মহাসড়কে যানজটের মতো আটকা পড়ে থাকে। এর সাথে আবার যুক্ত হয়েছে ধর্ষণের মতো মহামারি ঘটনা। প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজ ভারী হয়ে আসে ভুক্তভোগীদের করুণ আর্তনাদে। আইনের দুর্বল শাসন ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি এই সংক্রমণকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আমি মনে করি, বাংলাদেশের সস্তা চলচ্চিত্র, নাটক, গল্প কিংবা উপন্যাস যেখানে নারীকে পুরুষদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সিনেমায় নারী অপহরণ, খুন, ধর্ষণ ও মনোরঞ্জনের সচিত্রগুলো কোনো না কোনোভাবে মানুষের মনজগতে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। তা ছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রেখে সন্তান উৎপাদন ও লালন-পালনের হাতিয়ার হিসেবে দেখার সামাজিক যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাও সমানভাবে দায়ী। পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়ভাবে ও শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, সমান অধিকার ও সমান মর্যাদার বিষয়টি যদি আমরা নিশ্চিত করতে না পারি তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা আরও করুণ হবে বলে আমি আশংকা করছি। এভাবে আমাদের খোয়াবগুলো দিনের পর দিন খোয়া যায়। ফলে আমাদের আর স্বপ্ন দেখার কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

পরিশেষে, শুরুর গল্পটা দিয়েই শেষ করতে চাই। যদিও আমার কাছে মনে হয়েছে যে, গল্পটিতে স্বপ্নকে একটি রূপক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা আর কোনো স্বপ্ন দেখতে পারছেন না। কারণ রাজ-ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসছে এবং দীর্ঘদিনের অনাবৃষ্টির ফলে কোনো ফসলের চাষাবাদ নেই, এমনকি বীজ বপনের জন্য বিন্দু পরিমাণ শস্য-দানাও নেই, পানির ফোয়ারা শুকিয়ে গেছে এবং অসংখ্য লোক নানান রোগে আক্রান্ত, প্রতিদিন অনাহার ও মড়কে মানুষ মারা যাচ্ছে। এই দুর্দিনে ভাগ্যক্রমে ওই রাজ্যে অন্য আর এক রাজ্যের কিছু পর্যটক ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে আসে। প্রজাদের কাছে বিস্তারিত শুনে এবং দেখে তারা নিজেদের মজুদ করা খাদ্যের বীজ থেকে বিভিন্ন ধরনের চারা উৎপাদন করে এবং কূপ খনন করে চাষাবাদ শুরু করে। আর এভাবেই একদিন সেই রাজ্য আবারও সবুজ ও ফসলে ভরে ওঠে এবং প্রজারা প্রাণ ফিরে পায়। রাজা আবারও নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

অস্ট্রেলিয়ার দাবানল

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত অস্ট্রেলিয়া একটি অন্যতম দেশ ও মহাদেশ। পৃথিবীর শীর্ষ দশটি বসবাসের উপযোগী শহরগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে বেশ কয়েকটি। অস্ট্রেলিয়া একটি Multicultural (বহু সংস্কৃতি) দেশ এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোক ওখানে বসবাস করে।

অস্ট্রেলিয়ার সুবিশাল আকাশ, ঝলমলে রোদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাগর সৈকত, চারিদিকে সবুজের বেষ্টনী এবং নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনে এখনো সতেজ স্মৃতি হয়ে আছে যা আজীবন ভোলার মতো নয় এবং সহজেই আমৃত্যু পর্যন্ত ভোলা যাবে না। আমি মনে করি, অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমার প্রাণের ও আত্মার সম্পর্ক। তাই পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন হৃদয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন সময়ের আনন্দঘন মুহূর্ত, ভালোলাগার স্মৃতি, হতাশা ও বেদনার কথা ধারণ করে চলি অবিরত।

আমার শিক্ষা জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায় কেটেছে অস্ট্রেলিয়ায়। দুই টার্মে প্রায় ৭ বছর কাটিয়েছি অস্ট্রেলিয়ার এডেলেড শহরে। প্রথমবার ২০০৩-২০০৫ সালে যখন আমি মাস্টার্সে-এ পড়াশোনা করি Flinders University of South Australia (Masters of Policy and Administration)। দ্বিতীয়বার ২০১০-২০১৪ সালে যখন আমি পিএইচডি করি Flinders University of South Australia (PhD in Public Policy and Management)। প্রতিবারই আমি অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্কলারশিপ অর্জন করে পড়াশোনা করি। আমার জীবনে এই অসামান্য অবদানের পিছনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া সরকার ও জনগণ যাদের ট্যাক্সে পয়সায় আমি নিশ্চিন্তে পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছি তা আমি সবসময় ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি। অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করার সুবাদে মেলবোর্ন, সিডনি, ক্যানবেরা, পার্থসহ অনেক শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। সে কারণেই হয়তো অস্ট্রেলিয়ার আকাশ, বাতাস, জল, আবহাওয়া, শহর-বন্দর, মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি আমার কাছে মনে হয় অনেক দিনের চেনা। আর অস্ট্রেলিয়ায়

আগুন লাগলে সেই আগুন আমার মনের মধ্যেও লাগে। যেন আমার সব স্মৃতি পুড়িয়ে ফেলতে চায়।

প্রায় এক মাস ধরে সারা অস্ট্রেলিয়া জুড়ে প্রচণ্ড দাবদাহ এবং দাবানল চলছে। এই পর্যন্ত ২৪ জন মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, প্রায় তিন হাজার ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে এবং প্রায় ৫০ কোটি পশুপাখি আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা গেছে। বনজঙ্গল পুড়ে জীব বৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশের বিশাল ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। অস্ট্রেলিয়ার সরকার ও জনগণ এখন চরম দুর্দশার মধ্যে রয়েছে। পত্র-পত্রিকায় পড়ে জেনেছি যে, বিগত এক বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ায় কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। এমনকি ড্যামের সংরক্ষিত পানির ৬০% ফুরিয়ে গেছে, যা থেকে পানি শোধন করে বাসা-বাড়িতে পাঠানো হয়। এমনিতেই অস্ট্রেলিয়া একটি শুষ্ক দেশ, তার উপর আবার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির উপর। ফলে প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে বনে আগুন লেগেছে। চারিদিকে আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে মেলবোর্ন, সিডনি, ক্যানবেরা ও পার্থসহ অনেক শহর।

যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, ভূমিকম্প ও দাবানল সবসময় ভয়াবহ। সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা খুব সামান্য। কিন্তু এই দুর্যোগগুলো মানুষের জীবনে বিশাল ক্ষত রেখে যায়। পত্র-পত্রিকায় পড়ে ও টিভি দেখে জেনেছি যে, অস্ট্রেলিয়ায় ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছে এবং বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য বৃষ্টিপাতও হয়েছে। এই মুহূর্তে আরও অনেক বেশি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষ যখন খুব অসহায় হয়ে পড়ে তখন কোনো না কোনো এক অদৃশ্য শক্তির উপর ভর করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় আল্লাহ্, ভগবান কিংবা ঈশ্বর মানুষের মনে আশা জাগায়। মানুষের বিশ্বাসের ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে অবারিত বৃষ্টির ধারা। দগ্ধ, শুষ্ক ও বিরান ভূমি ফিরে পায় প্রাণ। প্রকৃতি আবারও কোমল, সবুজ, সতেজ ও চিরযৌবনা হয়ে ওঠে। প্রাণচাঞ্চল্য ও কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে বিস্তীর্ণ জনপদ। অতীতের দুঃখ-কষ্ট ভুলে ভোরের সোনালি আলোয় নতুনভাবে পথ চলার আমন্ত্রণে শুরু হয় নতুন দিনের নতুন জীবনের নিরন্তর গান।

আদিবাসী দিবস উদযাপন :
কাঠামোগত বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসানের কথা কেউ বলে না

গত ৯ই আগস্ট বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে পালিত হলো বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এ বছর বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল–'কাউকে পিছনে ফেলে নয়; আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নতুন অঙ্গীকারের (a new social contract) আহ্বান'। বর্তমানের সামাজিক অঙ্গীকার (social contract) সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা রুখতে পারেনি বরং একটি দৃশ্যমান বিভাজন (divisive society) ও প্রান্তিক সামাজিক অবস্থান (marginalized community) উপহার দিয়েছে।

বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির তাণ্ডবে এ বছর বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপনে অনেক ভাটা পড়েছে। এরপরও সীমিত পরিসরে ও অনলাইনে যেসব উদযাপনের খবর পড়েছি তাতে মনে হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মূল যে সমস্যা বা কাঠামোগত বৈষম্য (structural discrimination) তা অনেকটা নাচ, গান ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে চাপা পড়েছে। এ ধরনের সূক্ষ্ম কাঠামোগত বহিষ্কার বা বর্জন (structural exclusion) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সরকারি কাঠামোর কেন্দ্র (centre) থেকে প্রান্তিক পরিধি (periphery)-তে সুকৌশলে অস্তিত্ব নির্মূলের জন্য (structural elimination) ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আমার জানামতে দুই-একটি সংগঠন বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে আনার চেষ্টা করেছে। যেমন– গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্মে তিন বছর ধরে উচ্ছেদকৃত খোলা আকাশের নিচে আমানবিকভাবে বসবাস করছে সান্তাল আদিবাসী জনগোষ্ঠী। সেখানকার একটি সংগঠন বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপন উপলক্ষে যে বিষয়গুলো দাবি আকারে ব্যানারে উল্লেখ করেছে তা হলো–আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য এসডিজি এজেন্ডা ২০৩০ (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন, আদিবাসীদের

সমান অধিকার ও বর্ণ বৈষম্য অবলুপ্তিকরণ। দিনাজপুর নবাবগঞ্জের সান্তাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন বিশ্ব আদিবাসী দিবসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু দাবি করেছে। যেমন–জাতীয় বাজেটে সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। আমার মনে হয় এই দুইটি সংগঠন বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির খুব কাছাকাছি আলোকপাত করেছে আর অন্যান্য জাতীয় ও এলাকাভিত্তিক সংগঠনগুলো শ্রাবণের বর্ষায় জলে ভেসে আসা কচুরিপানার মতো ভাসা ভাসা বক্তব্যনির্ভর কর্মসূচি দিয়েছে!

২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন-২০৩০ এজেন্ডা গৃহীত হয় যা বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। এর ১৭টি সুনির্দিষ্ট অভীষ্ট লক্ষ্য ও ১৬৯টি উন্নয়ন নির্দেশক সূচক রয়েছে। আদিবাসী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যে অভীষ্ট লক্ষ্য ও উন্নয়ন নির্দেশক সূচকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাঁর মধ্যে অভীষ্ট লক্ষ্য-৪ : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমানুপাতিক গুণগত শিক্ষা (inclusive and equitable quality education), অভীষ্ট লক্ষ্য-৮ : অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (inclusive and sustainable economic growth), অভীষ্ট লক্ষ্য-১১ : অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরাপদ মানব বসতি (human settlements inclusive and safe), অভীষ্ট লক্ষ্য-১৬ : অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, সকলের জন্য ন্যায়বিচার, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সকল স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ (inclusive society, justice for all, accountable and transparent institutions, participatory and representative decision-making at all levels)। আমার মতে, আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগুলোই হচ্ছে নতুন অঙ্গীকারনামা তা না হলে আদিবাসী অধিকার-আন্দোলন ও কর্ম পরিকল্পনা খাতা কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, বাংলাদেশের যে কোনো ক্ষুদ্র জাতি, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিলীন করতে হলে প্রথমত সরকারি কাঠামো, সরকারি দলিলপত্র, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, অধ্যাদেশ, পঞ্চ-বার্ষিকী কর্ম পরিকপনা, জাতীয় বাজেট, পাঠ্য পুস্তক ও আইন থেকে তাদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলে দিতে হয়। বাংলাদেশে এই কাজটি অত্যন্ত সুকৌশলে ও

দীর্ঘ মেয়াদি নীল-নকশার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিন্তা, চেতনায়, মননে ও দর্শনে অত্যন্ত সুচারুরূপে ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সরকারি কাঠামো, সরকারি দলিলপত্র, পাঠ্য পুস্তক ও আইন থেকে আড়াল করে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে তাদের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলীন করার একটি অশুভ প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে আদিবাসীদের সংখ্যা বর্তমানে মানবিকতার কারণে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সমান–প্রায় ১২ লাখ। বাংলাদেশ সরকার পবিত্র সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর আগে আদিবাসীদেরকে কখনও উপজাতি আবার কখনও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে অপমানজনক নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাস্তবে জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার 'আদিবাসী' শব্দটি বাতিল ঘোষণা করেছে অর্থাৎ কোনো সরকারি নথি-পত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি আর ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি সম্প্রতি বাংলাদেশের এনজিও ব্যুরো একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে যে, বাংলাদেশের সকল এনজিও (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) যারা 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যবহার করে, তারা যেন অচিরেই তাদের নাম পরিবর্তন করে এবং তাদের দলিলপত্র থেকে 'আদিবাসী' শব্দটি চিরতরে নির্মূল করে দেয়। এখন প্রসঙ্গ হলো, বাংলাদেশের কোনো জনগোষ্ঠী নিজেদের যে নামে অভিহিত করতে চায় কিংবা যেভাবে তাদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে জীবন ধারণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি সব ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে তবে সেটা একটি উদার গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষণ নয়। যে গণতান্ত্রিক সরকার সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বহু সংস্কৃতিকে লালন ও ধারণ করে এবং সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করে, আমার মতে সেই সরকার হচ্ছে একটি উদার গণতান্ত্রিক সরকার।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে অস্ট্রেলিয়ার দুটি ঘটনার অবতারণা করতে চাই। কারণ অস্ট্রেলিয়া একটি Multicultural (বহু সংস্কৃতি) দেশ এবং পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোক ওখানে বসবাস করে। প্রথমত ভিনসেন্ট লিঙ্গারি (১৯০৮-১৯৮৮) নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসী (এবরজিনাল) অধিকার কর্মীর সংগ্রামী জীবনের কথা। গুরুঞ্জি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত

ভিনসেন্ট লিঙ্গারি মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর বাবার মতো নরদান টেরিটরির ওয়েভ হিল স্টেশন নামক ৩৫০০ বর্গমাইল জুড়ে এক কোম্পানির গরুর খামারে কাজ শুরু করেন। কাজের বিনিময়ে তিনি তেমন কোনো টাকা পেতেন না। তিনি আরও দেখতে পেলেন যে, স্থানীয় আদিবাসীদের (এবরজিনাল) সাথে কুকুরের মতো আচরণ করা হয়। ভালো বেতন, রেশন ও আদিবাসী (এবরজিনাল) নারীদের সুরক্ষার দাবিতে তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬৬ সালে স্থানীয় গুরুঞ্জি আদিবাসী সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে ধর্মঘট শুরু করে। এই ধর্মঘট নয় বছর ধরে অব্যাহত ছিল, যা অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। ১৯৬৭ সালে তিনি নরদান টেরিটরির গভর্নর জেনারেলের নিকট আবেদন করেন যেন আদিবাসীদের (এবরজিনাল) জমি আদিবাসীদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে তারা নিজেদের জমির উপর নিজেরাই গরুর খামার করতে পারে। আদিবাসীদের জমির অধিকারের জন্য সমর্থন আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন তিনি মেলবোর্ন ও সিডনিসহ বড় শহরে গান গেয়ে পথসভা ও অ্যাডভোকেসি করেছেন। ১৯৭৩ সালে হুইটলাম সরকার আসার পর গুরুঞ্জি আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিকট ওয়েভ হিল স্টেশন নামক খামারের ৩২৩৬ বর্গমাইল জমি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তথাকথিত মালিক লর্ড ভেসটির সাথে চুক্তি করে। এর ফলে ১৯৭৫ সালের ১৬ই আগস্ট তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গফ হুইটলাম সেখানে উপস্থিত হয়ে ভিনসেন্ট লিঙ্গারির হাতে এক মুঠো মাটি দিয়ে বলেন, 'আমি অস্ট্রেলিয়ান আইন মোতাবেক প্রমাণ হিসেবে এই জমির দলিলপত্র তোমার কাছে হস্তান্তর করছি এবং চিহ্ন স্বরূপ তোমার হাতে এই মাটি দিলাম যা এখন থেকে অনন্তকাল অবধি তোমাদের এবং তোমাদের ছেলে-মেয়েদের অধিকারে থাকবে।'

দ্বিতীয়ত ২০০৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড অস্ট্রেলিয়ার সংসদে প্রথম বারের মতো ঔপনিবেশিক শাসনামলে আদিবাসীদের (এবরজিনাল) উপর নির্যাতন, গণহত্যা, সন্তান চুরি, বঞ্চনা ও বৈষম্যের জন্য ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করেন। এর ফলে কিন্তু স্থানীয় আদিবাসীদের (এবরজিনাল) প্রতি বঞ্চনা ও বর্ণ বৈষম্য কমেনি বরং মূল স্রোতঃধারায় তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমতা ও ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

এই দুইটি ঘটনা উল্লেখ করার কারণ হলো পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছে করলেই অধিকার বঞ্চিত, শোষিত, প্রান্তিক আদিবাসী ও অনগ্রসর

জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন–কিছুদিন আগেই খবরে দেখলাম, ওপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি-অধ্যুষিত অরণ্য শহর জঙ্গল মহাল (জল, জমিন, জঙ্গল)-এর ঝাড়গ্রামে আয়োজিত বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ভারত সবচেয়ে বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। বিভিন্ন ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক থেকে এক অনন্য দেশ। পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার ২৯৪ আসনের মধ্যে শিডিউল কাস্টদের জন্য ৬৮টি এবং শিডিউল ট্রাইবদের জন্য ১৬টি আসন সাংবিধানিকভাবে বরাদ্দ রয়েছে। জঙ্গল মহালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনে হয়তো আদিবাসীদের রাতারাতি ভাগ্য উন্নয়ন হবে না। কিন্তু জনজাতির নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ধামসা ও মাদলের তালে তালে তাঁর নাচার দৃশ্যটি অনেক অর্থ বহন করে। একটি সরকার প্রধানের দুই হাত যখন বহুদিনের বঞ্চিত মানুষদের হাত স্পর্শ করে ও তাদের আলিঙ্গন করে সেই হাত আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়, যা তাদের মনে আশা, ভরসা ও বিশ্বাস জোগায়। রাষ্ট্র ও সরকার কাঠামোর মধ্যে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমতা ও ন্যায়বিচারের অংশ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব ও অন্যান্য অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাচিত এমএলএদেরকে (গখঅ) তাঁর নতুন মন্ত্রিপরিষদে আপন করে নিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাচার দৃশ্যটি দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০তম জন্মবার্ষিকী, মুজিব বর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আদিবাসী শিল্পীদের মনোমুগ্ধকর নাচ-গান উপভোগের দৃশ্যটি। এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে অর্থ ও তাৎপর্যগত দিক থেকে অনেক মিল ও অমিল হয়তো থাকতে পারে।

এখানে অবশ্যই স্বীকার্য যে, বাংলাদেশের আদিবাসী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কর্মসূচি 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)'-এর মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত ও শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলায় রূপান্তর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিবছর আদিবাসী ও অনগ্রসর

জনগোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য প্রকল্পটি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর থেকে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ওয়েব সাইটে গিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই একটি উক্তি পড়ে আরও আশাবাদী হয়ে উঠি, 'যখন আমরা উন্নয়নের কথা বলি তখন আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথাই বলি।'

অনেক আশাবাদের পরও হতাশ হতে হয় যখন দেখি, চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার জাতীয় বাজেটের মধ্যে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ২৯০ দশমিক ৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং বিশেষ এলাকার (সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের) জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)-এর বাজেট মাত্র ১০০ কোটি টাকা।

সম্প্রতি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি উক্তি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তা হলো–'মুখে নৌকা অন্তরে বিষ, মুখে মুজিব আদর্শ আর মনের ভিতরে নিজের স্বার্থ।' এর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ গরিব হতে পারে, শিক্ষা বঞ্চিত থাকতে পারে এবং অনাহারে মরতেও পারে কিন্তু এদের মধ্যে ভিক্ষুক নেই বললেই চলে। লাল সবুজের এই দেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতার চেতনা যারা হৃদয়ে ধারণ করে তাদের ভুল বানানে নৌকা ও বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত টি-শার্ট পরে শোভাযাত্রার প্রয়োজন পড়ে না!

চেনা মুখ পাবে ত্রাণ আর সংখ্যালঘুর যাবে প্রাণ

প্রকৃতি বড়ই বিস্ময়কর! মানুষ প্রাণিকুলে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রাণী হওয়ার পরও সামান্য ক্ষুদ্রতম প্রাণী বাদুড় কিংবা বনরুই থেকে নিঃসৃত ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত ও অসহায়। এখন করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বের আতঙ্কের বিষয়।

এই করোনার প্রাদুর্ভাবের সময় গরিব, অসহায়, দিনমজুর, নিম্ন আয়ের লোকজন, আদিবাসী ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বর্তমান সরকার ত্রাণ সরবরাহ করছে। পাকিস্তানের মতো রাষ্ট্রে হিন্দু ও সংখ্যালঘুরা যে সরকারি ত্রাণ পাবে না তা খুব স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে দরিদ্র হিন্দু এবং পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী সংখ্যালঘুরা যে ত্রাণ পাবে না তা কোনোমতেই মেনে নেয়া যায় না।

এখনও আদিবাসী ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজন সরকারি ত্রাণ থেকে বঞ্চিত। শুধু এই করোনার সংকট কালে নয়, অতীতেও বন্যা, খরা, মঙ্গা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আদিবাসী ও দুর্গম এলাকায় বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজন সবসময় সরকারি ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা সবচেয়ে অবহেলিত ও ভুক্তভোগী।

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্মে তিন বছর ধরে উচ্ছেদকৃতরা খোলা আকাশের নিচে অমানবিকভাবে বসবাস করছে। এক পত্রিকায় পড়েছিলাম, একজন সাংবাদিক গোবিন্দগঞ্জের দায়িত্বরত সরকারি এক কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বাগদা ফার্মের আদিবাসীদের এই করোনা দুর্যোগের সময় ত্রাণ দেয়া হবে কিনা? উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, প্রয়োজনের তুলনায় ত্রাণ অনেক কম আছে, যদি বেশি পাওয়া যায় তবে তাদেরকে দেয়া হবে। এই হলো ত্রাণ সম্পর্কিত সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের চিন্তা, চেতনা ও দর্শন। এইটুকু জানি যে, আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু তা সমভাবে বণ্টন করলে সবাই উপকৃত হবে। যদি ধরি, একজন জনপ্রতিনিধির ৪০

হাজার পরিবারকে দেয়ার জন্য ত্রাণ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে কি অন্তত এক হাজার পরিবারও দরিদ্র হিন্দু এবং পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসী সংখ্যালঘুরা পাবে না? শুধু এই করোনার সংকট কালে নয়, অতীতে এবং বর্তমানেও বাংলাদেশ সরকারের ৩০টিরও বেশি সামাজিক সুরক্ষা খাত থেকে তেমন কোনো সাহায্য পায় না। কেননা তাদের নাম কোনো এক অদৃশ্য কারণে ও কলুষিত রাজনীতির বেড়াজালে কখনও তালিকায় থাকে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্র কাঠামো ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি হিসেবে কখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এখনও আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সরকারি কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্তকরণ শুধু বই-পুস্তকে ও খাতা-কলমে রয়ে গেছে।

এই করোনার সংকট কালে, সরকারি যে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে, তার মধ্যে অনেক অনিয়ম লক্ষ করা যাচ্ছে। ত্রাণ বিতরণের সময় জনগণের নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় না রাখা, অনেক দানবীর আবার রাস্তার মধ্যে টাকা বিলিয়ে দিচ্ছেন আর হাজারো আম-জনতা টাকা কুড়ানোর জন্য এক প্রকার যুদ্ধ করছেন, কোথাও বা দেখা যায় গরিব-মেহনতি মানুষ ত্রাণের ট্রাকের পিছনে মৌমাছির মতো ছুটছেন। আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, অনেক জনপ্রতিনিধি ও সরকারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ফেসবুকে মোবাইল নাম্বার দিয়ে ত্রাণের জন্য ফোন করতে বলেছেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষকে ফোন করতে হবে কেন? কর্মহীন গরিব-মেহনতি দিনমজুর লোকদের মোবাইল নাও থাকতে পারে কিংবা টাকার অভাবে মোবাইলে ফ্লেক্সি লোড নাও করতে পারে। আবার ভোটের সময় তো উনাদের বাড়ি বাড়ি যেতে কোনো অসুবিধা হয় না।

সবচেয়ে পীড়াদায়ক বিষয় হচ্ছে, কর্মহীন গরিব-মেহনতি দিনমজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য বরাদ্দ কৃত সরকারি ত্রাণ বণ্টনে নিয়োজিতরাই এসব ত্রাণের চাল চুরি ও খোলা বাজারে বিক্রি করছে। বাংলাদেশে যে কোনো জাতীয় দুর্যোগের সময় ধারাবাহিকভাবে ত্রাণ চোর ও চাল চোরের আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসের পাতা থেকে জেনেছি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দুর্যোগময় অবস্থায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও কিন্তু একটি কম্বল বা এক কেজি লবণ পাননি। সেই থেকে গরিবের জন্য বরাদ্দকৃত ত্রাণ চুরি এখনও অব্যাহত আছে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে হাতে গোনা কয়েক জন ছাড়া মহান জাতীয় সংসদের ৩৪৫

জন এমপির জনসচেতনতা ও ত্রাণ কার্যক্রম দেখি না। এই জন্যই হয়তো বেশ কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, এত নেতা কর্মী থাকতে কেন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে বঙ্গবন্ধুর লাশ মাটিতে পড়ে ছিল। দাফনের জন্য একটি সাদা কাপড়ও কেউ নিয়ে আসেনি। ইতিহাস বড়ই নির্মম ও নিষ্ঠুর কিন্তু আমরা ইতিহাস থেকে কেউ কোনোদিন কিছু শিখি না।

আসল সমস্যা হচ্ছে, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সৎ ও যোগ্য মানুষ যারা দেশকে ভালোবাসেন এবং দেশের মঙ্গল কামনা করেন তারা কিন্তু সরকারের প্রতিটি স্তরে অনুপস্থিত। দেশে অনেকেই সৎ ও যোগ্য মানুষ আছেন, তারা কিন্তু সীমাহীন অন্যায় অবিচার, দুর্নীতির জন্য অতিষ্ঠ এবং বাক-স্বাধীনতা, তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল আইন ও রাজনৈতিক রোষানলে পড়ার ভয়ে মূক ও বধির হয়ে আছেন। আবার অনেকেই বিবেকের দংশনে দেশ ছেড়ে বাইরে নির্বাসিত হয়ে আছেন। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাই দেশ চালাচ্ছেন। তাহলে এত বড় মন্ত্রিসভা এই গরিব দেশে রাখার আসলেই কি কোনো দরকার আছে?

চেক পয়েন্ট বাংলাদেশেই–বিদেশে প্রতিবাদ করে কী হবে?

প্রায় এক যুগ আগে সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান (সুপ্র)-তে কাজ করার সময় আমরা বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ, জনবান্ধব বাজেট, বাজেটে বিদেশি ঋণ, কর খাত সংস্কার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বৃদ্ধিসহ জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সারা দেশে সভা, সেমিনার, মানববন্ধন ও ক্যাম্পেইন করেছি। তাৎক্ষণিক ফলাফল হয়তো আমরা পাইনি, কিন্তু সুপ্রর মতো আরও অনেক সংগঠন এগুলো নিয়ে কাজ করলে আজকের বাংলাদেশ অন্যরকম হতে পারত।

সম্প্রতি কানাডায় বাংলাদেশিদের কালো টাকা পাচার ও দুর্নীতি নিয়ে বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছে। স্থানীয় জনগণকে সচেতন করার জন্য এটি নিঃসন্দেহে ভালো একটি উদ্যোগ। কিন্তু এ নিয়ে বাংলাদেশি কানাডিয়ান অভিবাসীরা কতটুকু কী করতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

কারণ পৃথিবীর অনেক দেশেই অভিবাসন আইন ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী নিদিষ্ট পরিমাণ মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে থাকা ও পরবর্তীকালে নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। যেমন–মালয়েশিয়া সেকেন্ড হোমের জন্য ৫ লাখ রিংগিত, অস্ট্রেলিয়ায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার, আমেরিকায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার, এবং কানাডায় ২ মিলিয়ন ডলার। এই টাকার পরিমাণ হচ্ছে ন্যূনতম। এর চেয়ে যত বেশি বিনিয়োগ করতে পারবেন, আপনার ভিসা ফাইল একদিনের জন্যও আটকা থাকবে না, যেখানে আমাদের মন্ত্রীরা একদিনের বেশি ফাইল আটকিয়ে না রাখতে নির্দেশ দেন। এটি অভিবাসী দেশগুলোর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার একটি আইন সম্মত প্রক্রিয়া।

এখন প্রশ্ন জাগে, নিম্ন মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ হাজার হাজার কোটি টাকা কিছু অসাধু, চোরা কারবারি, ঋণখেলাপি ও

দুর্নীতিবাজ লোকজন প্রতিনিয়ত পাচার করে দেশের সর্বনাশ করছে, তাদের প্রতিরোধের জন্য আমাদের সরকার ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কী করছে? আমার বিবেচনায়, কালো টাকা পাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মতো বড়ই জটিল ও নাজুক। আর্থিক খাতে নিয়মিত অডিট (নিরীক্ষা), তদন্ত ও পর্যালোচনা হয় কিনা তাও আমি ঠিকমতো জানি না। ধরুন, কারো বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে প্রথমে একটি তদন্ত কমিটি হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আমজনতার সামনে প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি বছর দুয়েক আগে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ হাজার কোটি টাকা রাতারাতি চুরি হয়ে গেল, কিন্তু তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আর জনতার ভাগ্য হলো না জানার। এর পরে, দায়সারা গোছের তদন্ত হওয়ার পর শেষমেশ একটি আইনি মামলা হয়, যার নিষ্পত্তি বাংলাদেশে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আসামিরা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, টাকার জোর, ক্ষমতার দাপট ও পেশিশক্তি বলে আগাম জামিন পেয়ে নিজেদের আখের গোছাতে থাকে। এর পাশাপাশি এক শ্রেণির উচ্ছিষ্টভোগী দোসর রয়েছে, যারা এসব চিহ্নিত অপরাধীর কালো টাকা পাচার ও অভিবাসন প্রক্রিয়ার যাবতীয় কাজ করে দেয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি, আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন এবং মামলায় আগাম জামিন লাভ করা পর্যন্ত অপরাধীরা বড় একটা লম্বা সময় পায়। এর মধ্যে তারা সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোনো না কোনো দেশে অভিবাসী হয়। সুতরাং অপরাধীদের চেকপয়েন্ট বাংলাদেশে। আর্থিক খাতে যদি আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে না আনা যায় তাহলে এ রকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ৩.৬১ বিলিয়ন ডলার। অধিকাংশ বিদেশি বিনিয়োগ বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে আসে। কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের যে কোনো এয়ারপোর্টে নামার পর যদি ইমিগ্রেশন জটিলতার মুখোমুখি হয় এবং ২-৩ ঘণ্টার পর লাগেজ পায় তাহলে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার নেতিবাচক ধারণা জন্মে। ভাগ্য ভালো থাকলে যদিও লাগেজ পায়, তবে দেখা যায় যে লাগেজটি কাটা এবং ভিতরে কোনো জিনিসপত্র নেই। সম্প্রতি যেমন–ঢাকা এয়ারপোর্টে এক চাইনিজ মহিলার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। আর প্রবাসী শ্রমিকদের বেলায় তো এসব অহরহই ঘটছে। এ ছাড়াও বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা ও জঙ্গিবাদের ভয়ও বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ দিন দিন কমার জন্য দায়ী।

অনেক ঘোর অমানিশার মধ্যে আরও একটি অশুভ সংবাদ, বাংলাদেশের ব্যাংক মালিকদের খেলাপি ঋণের পরিমাণ পৌনে ২ লাখ কোটি টাকা। অথচ প্রবাসীরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গত ছয় মাসে জবসরঃধহপব পাঠিয়েছে ১০০০ কোটি ডলার। এ কারণেই প্রবাসীদের অভিযোগ, যে টাকা তারা কষ্ট করে উপার্জন করে দেশে পাঠায় আবার সেই টাকা চোরা কারবারিরা পাচার করে বিদেশে আনে। আবারও প্রবাসী মেহনতি মানুষেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকা উপার্জন করে দেশে পাঠায়। এ যেন ঠিক দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের মতো। এই অসাধু চক্র থেকে বাংলাদেশিরা কবে মুক্তি পাবে তা একমাত্র বিধাতাই জানে!

মায়ের ভাষা বিনে মেটে কি মনের আশা?

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বিভক্তির ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে মুসলিম লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে তা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ও প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকেরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বাংলার জনগণের উপর অত্যাচার ও নানারকম বৈষম্য প্রদর্শন করত। পূর্ব বাংলার জনগণ পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকদের উপর চরম বিরক্ত ছিল এবং এই দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকে।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে করাচিতে একটি জাতীয় শিক্ষা সম্মেলন হয় এবং সেখানে ঘোষণা করা হয় যে, উর্দু এবং ইংরেজি হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ এবং জনগণ গর্জে ওঠে ও বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও আলোচনা সভায় দাবি ওঠে যে 'বাংলা এবং একমাত্র বাংলাকেই পূর্ব বাংলার রাষ্ট্র ভাষা করতে হবে।' বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের অন্যান্য কলেজের ছাত্ররা বাংলাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে বাদ দেয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে।

১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ তৎকালীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই' হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং যারা এর বিরোধিতা করবে তারাই হবে পাকিস্তানের দুশমন। ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে তিনি অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা কর্মী পরিষদ' গঠিত হয় এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত 'আরবি হরফে বাংলা লেখা'-এর তীব্র প্রতিবাদ

জানানো হয়। ওই দিন ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘট ও মিছিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এদিকে পাকিস্তানি সরকার সব ধরনের মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা আইন জারি করে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ৯টার দিকে ছাত্র ও সাধারণ জনতা রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে মিছিল, সমাবেশ ও ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য সমবেত হতে থাকে। সকাল ১১টার দিকে বিক্ষুব্ধ ছাত্র ও সাধারণ জনতা বিশাল মিছিল ও সমাবেশ নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই সময় মিছিলের উপর পাকিস্তানি পুলিশ গুলি চালায় এবং পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকত নিহত হয় এবং অনেক ছাত্র ও জনতা আহত হয়। ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যালের পাশে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং শহীদ সফিউর রহমানের পিতাকে দিয়ে এর উদ্বোধন করানো হয়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনেক প্রতিবাদ ও আলাপ-আলোচনার পর ১৯৫৪ সালের ৭ই মে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের 'রাষ্ট্রীয় ভাষা' হিসেবে অফিসিয়ালি স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সেই থেকে বাংলা আমাদের রাষ্ট্র ভাষা এবং প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রভাত ফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি যেভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো

একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে বাংলাদেশের ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অবদান রয়েছে। কেননা ভাষার জন্য সংগ্রাম, রক্ত ও জীবন দেয়ার ইতিহাস একমাত্র বাংলাদেশের রয়েছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে নেই। মহান ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম ও অর্জন এখানে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত ও মাইলফলক হিসেবে কাজ করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পিছনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অনেক অবদান রয়েছে। রফিকুল ইসলাম নামে একজন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি তৎকালীন জাতিসংঘের সেক্রেটারি কফি আনান সাহেবকে একটি চিঠি লেখেন। যার

বিষয়বস্তু ছিল–পৃথিবীর ভাষাসমূহকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করার এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে তিনি উল্লেখ করে বলেন যে, ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার প্রতি অধিকার অর্জনের বাংলাদেশের মানুষ জীবন দিয়েছে। পরবর্তীকালে এর পক্ষে অনেক বিস্তারিত তথ্য ও উপাদান উপস্থাপন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। এর সূত্র ধরে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সর্বপ্রথম ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। পরে ২০০২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত সব ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুজাতিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই বছর ২০২০ সালের ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'সীমান্তবিহীন ভাষা' অর্থাৎ ভাষার ব্যবহার ও গতিবিধি এক দেশ থেকে আর এক দেশে–যার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি ও সীমাবদ্ধতা নেই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষা হোক উন্মুক্ত

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার অবস্থান ৭ম এবং প্রায় ২৭০ মিলিয়ন মানুষ বাংলায় কথা বলে। ২০০৯ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাকে জাতিসংঘের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানান। ২০১০ সালে ইউনেস্কোর জরিপে বাংলাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আজ বাংলা ভাষা শুধু বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রবাসীদের কল্যাণে বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনে ২০১৬ সালে বাংলা ভাষাকে অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আজ আমরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, 'অভ্র লিপি'-র মাধ্যমে সহজেই মোবাইল ও কম্পিউটার থেকে ইংরেজি ফন্ট ব্যাবহার করে বাংলা লিখতে পারি। এই জন্য 'ভাষা হোক উন্মুক্ত' ও 'অভ্র লিপি'-র উদ্ভাবক ডা. মেহেদি হাসানকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তাই বাংলা ভাষা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এবং অবিরত বিস্তার লাভ করুক–ভাষা শহীদদের মাসে এই কামনাই করি।

চাই আইন ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন

প্রাসঙ্গিকভাবেই বাংলাদেশের আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই স্বাধীন দেশে বসবাস করতে গিয়ে যে সব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ও দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রচলিত আইন ও সংবিধানে যে সব করণীয় দিকগুলো রয়েছে তা আলোচনা করাই আমার এই ক্ষুদ্র লেখার অবতারণা মাত্র।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শুধু একটি বছরেই যথেষ্ট নয়। মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলার এই মহান রূপকারের জন্য অনাগত প্রতিটি বছর হোক মুজিব বর্ষ। এই প্রত্যাশাই যেন আমরা আজীবন লালন ও ধারণ করতে পারি।

বাংলাদেশে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে আদিবাসীদের সংখ্যা বর্তমানে মানবিকতার কারণে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের সমান–প্রায় ১২ লাখ। আর এই কারণে হয়তো, বাংলাদেশ সরকার পবিত্র সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীতে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসীরা 'আদিবাসী' হিসেবে পরিচয় দিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার 'আদিবাসী' শব্দটি বাতিল ঘোষণা করেছে অর্থাৎ কোনো সরকারি নথি-পত্রে 'আদিবাসী' শব্দটি আর ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি সম্প্রতি, বাংলাদেশের এনজিও ব্যুরো একটি অধ্যাদেশ জারি করেছে যে, বাংলাদেশের সকল এনজিও (বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) যারা 'আদিবাসী' শব্দটি ব্যাবহার করে, তারা যেন অচিরেই তাদের নাম পরিবর্তন করে এবং তাদের দলিলপত্র থেকে 'আদিবাসী' শব্দটি চিরতরে নির্মূল করে দেয়। এখন প্রসঙ্গ হলো, বাংলাদেশের কোনো জনগোষ্ঠী নিজেদের যে নামে অভিহিত করতে চায় কিংবা যেভাবে তাদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে জীবন

ধারণ করতে চায় সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি সব ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করে তবে সেটা একটি উদার গণতান্ত্রিক সরকারের লক্ষণ নয়। এর ফলে এসব ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ব একদিন বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তি হবে।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, বাংলাদেশের যে কোন ক্ষুদ্র জাতি, আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব বিলীন করতে হলে প্রথমত সরকারি কাঠামো, সরকারি দলিলপত্র, পাঠ্য পুস্তক ও আইন থেকে তাদের নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলে দিতে হয়। বাংলাদেশে এই কাজটি অত্যন্ত সুকৌশলে ও দীর্ঘ মেয়াদি নীল-নকশার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিন্তা, চেতনায়, মননে ও দর্শনে অত্যন্ত সুচারুরূপে ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সরকারি কাঠামো, সরকারি দলিলপত্র, পাঠ্য পুস্তক ও আইন থেকে আড়াল করে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে তাদের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলীন করার একটি অশুভ প্রক্রিয়া চলছে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ, বাংলাদেশের পাঠ্য পুস্তক থেকে অমুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের লেখা বাদ দেয়া। এটা বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের চিরতরে নির্মূল করার প্রথম ধাপ। এর পর, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর নানা ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন, সম্পত্তি দখল, নারীদের উপর নির্যাতন ও পরিকল্পিতভাবে ফেসবুকে ধর্মীয় উসকানি ও ধর্মীয় উন্মাদনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরের উপর হামলা ও জ্বালানো-পোড়ানোর মাধ্যমে জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। এভাবে বাংলার জনপদ একদিন সংখ্যালঘু শূন্য হবে।

গণতন্ত্র ইনডেক্স ২০১৯ অনুযায়ী, বিশ্বের মধ্যে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ৮০ অর্থাৎ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে 'হাইব্রিড রেজিমে' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যে গণতান্ত্রিক সরকার সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর বহু সংস্কৃতিকে লালন ও ধারণ করে এবং সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সবাইকে নিরাপত্তা প্রদান করে, আমার মতে সেই সরকার হচ্ছে একটি উদার গণতান্ত্রিক সরকার। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে এই বছর আগামী ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছর উদযাপন করবে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্রের স্বাদ আমরা এখনও আস্বাদন করতে পারিনি। এজন্য আমাদের বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ থেকে অনেক কিছু শিখে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

লাখো প্রাণের বিনিময়ে যেভাবে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের লাল-সবুজের পতাকা পেলাম

[মুখবন্ধ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাস মাত্র কয়েক পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে লেখা নিঃসন্দেহে একটি দুরূহ কাজ। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত অনেক বই, দলিলপত্র ও তথ্য-উপাত্ত গবেষণা করে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিরপেক্ষ ভাবে উপস্থাপন করাই এই লেখার মূল উপজীব্য বিষয়]।

পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিকামী মানুষই স্বাধীনতা চায় যেমনটি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়।' স্বাধীনতা শব্দটিই শর্তসাপেক্ষ যা কিনা আপনা-আপনি আকাশ থেকে পড়ে না। আদতে, তা অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সংগ্রাম করে অর্জন করে নিতে হয়।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চির সবুজ-শ্যামলে আবৃত বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রকে আধুনিক পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান করে নিতে বেশ অনেকটা দীর্ঘ সময় নিয়ে অনেক বন্ধুর ও সংগ্রামী পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। ইতিহাস থেকেই আমারা জানতে পারি, মুঘল সম্রাট ও নবাবদের শাসন-পরবর্তী বাংলাদেশকে কয়েকশ বছর ভিনদেশি শাসকদের উপনিবেশ (colony) হিসেবে এক ঘোর আমাবস্যায় দিন কাটাতে হয়েছে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের সাথে সাথে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার শেষ সূর্য অস্তমিত হয়। এর পর থেকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে ইংরেজরা প্রায় দুইশ বছর ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন ও শোষণ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকদের 'ভাগ করো ও শাসন করো' (Divide and Rule) প্রস্তাবনা ও দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য ভারত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামক দুটি আলাদা রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে জন্মলাভ করে।

বাংলাদেশে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে তা পূর্ব পাকিস্তান (East Pakistan) অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি অংশ হিসেবে সংযোজিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে দেশ ভাগের পর পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মানুষেরা ভেবেছিল, পাকিস্তান হলেই মুক্তি মিলবে। কিন্তু না, তখন বিভাজন দেখা গেল বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্নে। অর্থাৎ উভয়েই ধর্মীয়ভাবে মুসলিম হলেও সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের ফলে একসাথে চলা ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করা সম্ভব হচ্ছিল না অনেক ন্যায়সঙ্গত কারণে। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর পূর্ব অংশ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ পশ্চিম অংশের (পাকিস্তান) তুলনায় নানাভাবে বঞ্চিত হতে থাকে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর ছিল (১৯৪৭-১৯৭১) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ ও বঞ্চনার এক করুণ ইতিহাস।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণমূলক আচরণ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল মূলত তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের সশস্ত্র সংগ্রাম, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। যেসব কারণ, প্রেক্ষাপট ও নির্মম বাস্তবতা বাংলাদেশের মানুষকে এই সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। মোট জাতীয় বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকত পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। পশ্চিমা শাসকদের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে পূর্ব পাকিস্তান চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকার হয়। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ পাকিস্তান সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে এবং মানুষের মনে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কেবল অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপরও নানা ধরনের নিপীড়ন শুরু হয়। পাকিস্তানি শোষকেরা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার পাঁয়তারা করে। এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ঘোষণা দেন, 'উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৫২

সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার জন্যে এই আন্দোলন তীব্রতম রূপ ধারণ করে। এদিন পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো নাম না-জানা অনেকে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে হয়। যার ফল স্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পৃথিবীব্যাপী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়–কেননা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাস পৃথিবীর বুকে একটি বিরল ঘটনা।

আরও একটি লক্ষণীয় বৈষম্য ছিল সরকারি চাকরিতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত বাঙালি জনগণের প্রবেশাধিকার যা ছিল জনসংখ্যার অনুপাতে খুবই সীমিত। এমনকি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে বাঙালিরা ছিল ভীষণ অবহেলিত। সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অংশে সমগ্র বাহিনীর মাত্র ৫ শতাংশ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি এবং সামরিক বাজেটও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। রাজনৈতিক দিক দিয়েও বৈষম্য ছিল সবচেয়ে প্রকট। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান, পাকিস্তানের বৃহত্তর অংশ হওয়া সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক সব ধরনের ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তান কুক্ষিগত করে রাখে। যখনই পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতা যেমন–খাজা নাজিমুদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, অথবা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতেন, তখনই পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের পদচ্যুত করতেন কিংবা ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতো। যেমন–নানারকম টালবাহানা করে জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেন এবং দীর্ঘ ১১ বছর ধরে পাকিস্তানে তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই অনৈতিক ক্ষমতা দখল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের দ্বারা সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ভীষণভাবে বঞ্চিত ও নিগৃহীত আর তখনই পূর্ব বাংলায় ঘটে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও জরুরি ত্রাণকার্য পরিচালনায় গড়িমসি করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে। ঘূর্ণিঝড়ে

বিপর্যস্ত মানুষগুলোর প্রতি পাকিস্তান সরকারের এমন অমানবিক নিষ্ঠুরতা দেখে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে ১৯৭১ সালের ২৪শে নভেম্বর এক সভায় মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অদক্ষতার অভিযোগ তোলেন এবং অবিলম্বে তার পদত্যাগ দাবি করেন।

পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের রেশ কাটতে না কাটতেই এদিকে সময় ঘনিয়ে আসে নির্বাচনের। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের সাধারণ পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠনের অধিকার অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে ক্ষমতা কোনোভাবেই ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না এবং সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার তদানীন্তন সামরিক বাহিনীর অফিসারদের নিয়ে ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা বোনা শুরু করে।

এই ধরনের হঠকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পূর্ব বাংলায় বিক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। বঙ্গবন্ধু সারা দেশে দিনের হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর আহ্বানে সারা পূর্ব পাকিস্তান কার্যত অচল হয়ে যায়। ৫ দিন হরতাল শেষে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণে তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর এই ভাষণ গোটা জাতিকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাতাল করে তোলে।

এদিকে সারা দেশ যখন ক্ষোভে উত্তাল, তখন পাকিস্তানের সামরিক সরকার প্রধান ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সরকার

গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু একই সঙ্গে সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ভেস্তে গেলে সেদিন রাতেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত প্রদান করে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন। ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী শুরু করে অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যাযজ্ঞ। যদিও এই হত্যাযজ্ঞের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা তথাপি বাঙালি হত্যা পুরো দেশজুড়ে চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্র-শিক্ষকরাই ছিল তাদের বিশেষ লক্ষ্য এবং একটি জাতিকে মেধাশূন্য ও পঙ্গু করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাসের এই ন্যক্কারজনক গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানি সেনারা সেই রাতেই বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পাঁচ বিশ্বস্ত সহকারীকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লিখে যান ২৫-এ মার্চ মাঝ রাত কিংবা ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে যার অনুবাদ নিম্নরূপ :

'এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।'

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের উপর। বাংলাদেশের প্রথম সরকার দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে শপথ গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব পালন শুরু করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের মাধ্যমে ছাব্বিশে মার্চ হতে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধগুলো ছিল পরিকল্পনাহীন। কেননা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও প্রশিক্ষণের অভাব ছিল। ১৯৭১ সালের ১১ জুলাই কর্নেল এম এ জি ওসমানীকে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করে বাংলাদেশকে সর্বমোট ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে আসা অফিসারদের মধ্য থেকে প্রতিটি সেক্টরের জন্য একজন করে কমান্ডার নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষ ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে দেশকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করতে কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে তোলে মুক্তিবাহিনী। গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে মুক্তিবাহিনী সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ ভারতের কাছ থেকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও কূটনৈতিক সাহায্য লাভ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল সীমান্ত এলাকায় এবং ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ লাভ করত। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার মুখে সারা দেশে শুরু হয়ে যায় প্রতিরোধযুদ্ধ এবং জীবন বাঁচাতে প্রায় ১ কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সামরিক হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং লাখ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি ঘটে। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পতন আনিবার্য হয়ে ওঠে তখন ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরিভাবে জড়িয়ে পড়ে।

প্রায় নয় মাস রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সারা দেশে পরাজিত হতে থাকে এবং পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪.৩১ মিনিটে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের দলিলে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, যিনি ভারতীয় ও বাংলাদেশি বাহিনীর যুগ্ম কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-সেনাপ্রধান এয়ার কমোডর

এ কে খন্দকার আত্মসমর্পণে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এরই মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয় এবং বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় লাল সবুজের পতাকা সংবলিত বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্য রাগে

আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অপরিহার্য সংস্কৃতির অংশ বাংলা নববর্ষ বরণ। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৮৫ সালে মুঘল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। তখন থেকেই বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব বাঙালির সর্বজনীন প্রাণের উৎসব হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ' গানটি বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের প্রধান একটি গান যা ছাড়া পহেলা বৈশাখের যে কোনো অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় না। অতিসম্প্রতি গানটির কয়েকটি লাইন যেমন–'মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা, অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা' নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের ধরন নিয়ে। কেননা বাংলাদেশে ঢাকার রমনা বটমূলসহ বিভিন্ন স্থানে পহেলা বৈশাখকে স্বাগত জানানো হয় ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। সূর্য পূজারিরা সূর্যোদয়কে যে কোনো শুভ কাজের জন্য বেছে নেয়। বছরের প্রথম দিন সূর্যের আলোয় স্নান করে এই পৃথিবী পরিশুদ্ধ হবে এটাই তাদের বিশ্বাস। অনেকের মতে, এই উৎসব অগ্নিপূজক ও সূর্য পূজারিদের এবং কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় লোকজনের পক্ষে বিধর্মীদের এই অনুষ্ঠান ও হিন্দু দেব-দেবীদের বাহন যেমন–লক্ষ্মী পেঁচা, বাঘ, সিংহ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আজকের মতো প্রতিষ্ঠিত ধর্ম যেমন–খ্রিষ্টান, ইসলাম, সনাতন (হিন্দু), বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও বাহাই ছিল না। যিশু খ্রিষ্টের জন্মের পূর্বে বলতে গেলে মানুষ তখন বিভিন্ন দেব-দেবীর পুজা করত, আবার কখনও সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, পর্বত এবং বড় কোনো গাছকে ঈশ্বর ও দেবতা হিসেবে আরাধনা করত। তেমনি ছিল মূর্তি পূজারি বা পৌত্তলিক, অগ্নিপূজক ও সূর্য পূজারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মধ্য এশিয়ায় আর্য জাতির বাস ছিল। এই আর্যদের একটি অংশ পশ্চিমে (পারস্য সাম্রাজ্য, ইতালিতে রোম সাম্রাজ্য, স্পেন, জার্মানি, ইংল্যান্ড) এবং আর্যদের আর একটি অংশ হিমালয় পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। এরা মূলত শক্তির পূজারি ছিল। সূর্য ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। সূর্য আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করে, উত্তাপ দেয় আবার ফসল ফলায়। সমস্ত সৃষ্টির মূলে সূর্য। তাই সূর্য দেবতার মাঝে তারা ত্রিমূর্তি (সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও শাস্তিদাতা) এক ঈশ্বরের রূপ দেখতে পেয়েছিল।

পরবর্তীকালে এই ত্রিমূর্তিতে এক ঈশ্বরের ধারণা হিন্দু ও খ্রিষ্টান ধর্মে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। হিন্দু ধর্ম মোতাবেক, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অষ্টম অবতার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২৮ সালে যার জন্ম) অর্থাৎ অদৃশ্য ভগবানের মানব সদৃশ হলো শ্রীকৃষ্ণ। অনেকের মতে, যেই বিষ্ণু সেই কৃষ্ণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মিলিয়ে হয় এক পরমেশ্বর। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টান ধর্ম মতে, যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। পিতা ঈশ্বর, পুত্র যীশু ও পবিত্র আত্মা এই তিন জন মিলিয়ে হয় এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর (Holy Trinity)।

বর্তমানকালে, যীশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) খ্রিষ্টানদের একটি অংশ, বিশেষ করে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) সর্বপ্রথম ১৭৩২ সালে চেক প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন মোরাভিয়ান প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীতে অনুষ্ঠিত হয়। যার হাত দিয়ে এই উপাসনা রীতির প্রচলন হয় তিনি ছিলেন জন হাস (১৩৭২-১৪১৫) নামক একজন ক্যাথলিক পুরোহিত। খ্রিষ্ট মণ্ডলীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম তৎকালীন পোপের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রটেস্ট (প্রতিবাদ) করেন, যা মারটিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)-এর প্রায় একশ বছর আগে।

ক্যাথলিক পুরোহিত জন হাসের প্রটেস্টের (প্রতিবাদ) বিষয়বস্তু ছিল ল্যাটিনের পরিবর্তে স্থানীয় জনগণের ভাষায় উপাসনা রীতির প্রচলন, বিবাহিত পুরোহিত, সকল খ্রিষ্ট ভক্তকে কমুনিয়ন প্রদান এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্যস্থান প্রায়শ্চিত্ত কালের (purgatory) বিলোপ সাধন করা। তখন থেকে ক্যাথলিক ধর্মেরও যুগের সাথে তাল মিলিয়ে অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার সাধিত হয়েছে। বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, যারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করে না অথচ ভালো কাজ করে তারাও মুক্তিলাভ লাভ করবে এবং স্বর্গে যাবে।

পবিত্র বাইবেল মতে, ইহুদিরা ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিষ্টকে তৎকালীন রোম সম্রাট টাইবেরিয়াসের অধীনস্থ জুদেয়া (প্যালেস্টাইন) অঞ্চলের শাসনকর্তা পিলাতের শাসন আমলে মধ্যযুগীয় কায়দায় ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে। যীশু খ্রিষ্ট মৃত্যুর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবারে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) মূলত বাইবেল কেন্দ্রিক। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে যা লেখা আছে তাঁর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

এই দিন মরিয়ম মগদালিনি নামক এক নারী যীশুর কবরে যান। বাইবেলে যে সময়টার বিবরণ দেওয়া আছে তা হলো–রবিবার খুব ভোরে (মথি ২৮:১), খুব ভোরে (লুক ২৪:১), রবিবার দিন সকাল সকাল–তখনও অন্ধকার ছিল (জন ২০:১) এবং ভোরে, ঠিক সূর্য ওঠার পর (মার্ক ১৬:২)। সুতরাং যীশু খ্রিষ্ট যে সকল প্রকার দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও অন্ধকার ঘুচিয়ে সূর্যের আলোর সাথে পুনরুত্থান করেছেন তা খুবই স্পষ্ট। তাই সময় ও মাহেন্দ্রক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) খ্রিষ্টের পুনরুত্থানেরই জয়গান যা আনন্দঘন পরিবেশে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয়।

পরিশেষে বর্তমান কালের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, যে সূর্য এই জাগতিক ও মনো-জাগোতিক সকল অন্ধকার দূর করে আমাদের আলোর পথ দেখায়, যে সূর্য এই ধরিত্রীর বুকে ফসল ফলায় ও আমাদের দেহের বল বৃদ্ধি করে, সেই সূর্য যেন আজ কি না আমাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে! আমাদের চিন্তা, মনন, দর্শন ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন ভাঙতে না পারলে 'প্রতিদিন তোমায় দেখি সূর্য রাগে, প্রতিদিন তোমার কথা হৃদয়ে জাগে, ও আমার দেশ ও আমার বাংলাদেশ' নামক জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানসহ কত শত গান ও কবিতা যে আমাদের সংশোধন, পরিমার্জন ও চিরতরে বাতিল করতে হবে কিংবা কত সহস্র সাহিত্য কর্মের যে অপমৃত্যু ঘটবে তার খবর কে বা জানে!

ফাল্গুন এবং বসন্ত বরণে ঝুমুর গান

শীতের জড়তা ও রুক্ষতাকে বিদায় জানিয়ে পহেলা ফাল্গুনের হাত ধরে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অপরিহার্য সংস্কৃতির অংশ আগুন রাঙা ফাল্গুনের এই বসন্ত বরণ। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৮৫ সালে মুঘল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। নতুন বছরকে কেন্দ্র করে ১৪টি উৎসবের প্রবর্তন করেন তিনি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বসন্ত উৎসব।

বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি বসন্তের আগমনে বর্ণিল রূপ ধারণ করে। নানান রঙের ফুল ও পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে এই ঋতুরাজ বসন্ত। তাই ফাল্গুনের এই মন-মাতানো উৎসবকে কখনও ফুলেল বসন্ত, মধুময় বসন্ত, যৌবনের উদ্দামতা বয়ে আনার বসন্ত আর আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও উদ্বেলতায় মন-প্রাণ কেড়ে নেয়ার দিন হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রকৃতির রূপ ও বর্ণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাল আর হলুদের বাসন্তী রঙে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সাজিয়ে বসন্তের উচ্ছলতা ও উন্মাদনার এই উৎসব বাঙালির সর্বজনীন প্রাণের উৎসব হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়।

এ লেখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ফাগুনের এই বসন্ত বরণ উৎসবে ঝুমুরের তালে নাচ ও গান পরিবেশন করা হয়। আমার এই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঝুমুর কীভাবে এই ফাল্গুনের বসন্ত বরণ উৎসবে এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে, এর উৎপত্তি, প্রচার ও প্রসার এবং বসন্ত বরণ উৎসবে কেনই বা যুগ যুগ ধরে এত জনপ্রিয় তা জানার চেষ্টা করা এবং পাঠকদের এই বিষয়ে সহভাগিতা করা।

ঝুমুর গানের ইতিকথা

ঝুমুরের প্রকৃত বয়স কত, অর্থাৎ কত দিন আগে ঝুমুর প্রথম লেখা হয়েছিল

তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট যে, ঝুমুর একটি অতি প্রাচীন শিল্প। এই উপমহাদেশের অগণিত নৃত্য ও সঙ্গীত কলার মধ্যে বহুল প্রচলিত একটি সঙ্গীত কলাটির নাম ঝুমুর যা সাধারণত নৃত্য, গীত ও বাদ্য বাজনা সহকারে পরিবেশিত হয়।

ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের মতে, ঝুমুর গান প্রাচীনকাল থেকেই এই উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও বৈষ্ণব পদাবলি ঝুমুর গানের আঙ্গিকে গাওয়া হতো। এমনকি পদকল্পতরুর পদে রয়েছে, 'যুবতী যূথ শত গায়ত ঝুমরী।' অর্থাৎ যুবতী মেয়েরা একসঙ্গে যে গান পরিবেশন করে, তাই হলো ঝুমুর বা ঝুমরী।

ইতিহাস থেকে আরও জানা যায় যে, ঝুমুর গান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ (পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা), ঝাড়খণ্ড, বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত একটি লোকগীতিবিশেষ এবং প্রেমভাব ও সুরের লালিত্যে ঝুমুর গান বাংলার সাধারণ শ্রেণির মানুষের মধ্যে দ্রুত বিস্তার ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্রকৃতিগতভাবে, লালচে-কালো মাটির এই অঞ্চল বা দেশের শাল-পিয়াল-মহুয়ার গহিন সজীবতা, অজস্র ছোট ছোট টিলা-পাহাড়, জঙ্গলের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা অসংখ্য গ্রাম, সেই গ্রামের মাটির মানুষেরা, বিভিন্ন জনজাতি, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার ধরন, জীবনের বিচিত্র লীলা-সংস্কৃতির সহজ বিকাশ, বছরভর নানা আনন্দ-বিষাদের উৎসব, পরব, পুজো-পার্বণ এই অঞ্চলের মানুষের ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঝুমুর নাচ-গান ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ছোটনাগপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্য ভারত ব্যাপিয়া গুজরাটের সীমা পর্যন্ত যে আদিবাসী সংগীত প্রচলিত আছে, তাহা ঝুমুর নামে পরিচিত।' এ ছাড়াও বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. বঙ্কিমচন্দ্র মাহাতের মতে, 'ঝুমুর ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট প্রেম সংগীত। করম নাচ ও নাচনী নাচের গান ঝুমুর নামে পরিচিত।' অর্থাৎ এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেমন সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, খাড়িয়া, বীরহড়দের মধ্যে যে নিজস্ব সংস্কৃতি বর্তমান এবং ঋতুভেদে বিভিন্ন পরব উপলক্ষে যেসব গান ও নাচ অনুষ্ঠিত হতো তাই ঝুমুর নামে সমাধিক পরিচিত।

বসন্ত বরণে ঝুমুর গান

ফাল্গুনের এই বসন্ত বরণ উৎসবে ঝুমুর নাচ-গান ছাড়া যেন পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ঝুমুর গানে যে শব্দমালা প্রায়ই ব্যবহার করা হয় তা হলো–পলাশ ও শিমুলের গাছে যেন আগুন ধরেছে, বসন্তের কোকিল যেন ভালোবাসার মানুষটির কথা জানান দিচ্ছে, শাল ও মহুয়ার বনে যেন আজ খুশির জোয়ার দেখা দিয়েছে। কারণ বিভিন্ন জনজাতি ও আদিবাসীরা সাধারণত এই সময় ফুলের উৎসব 'বাহা' পালন করে থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রচলিত ও জনপ্রিয় ঝুমুর গানের উদাহরণ দেয়া হলো :

আজ ফাগুনে আগুন লাগে পলাশে শিমুলে, অজয় শিলায় কংসাবতি দামোদরের কূলে, ধিম ধি ধিম ধিম ধি ধিম ধামসা মদল বোলে, দেখবি রে চল নাচছে সবাই ঝুমুর গানের তালে

'বসন্ত বহিল সখী কোকিলা ডাকিল রে, এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে, বাঁশেরও বাঁশরি সখী সরল কাঠের বাঁশি হে, বিনা দুঃখে বাঁশি বলে রাঁধা রাঁধা রে।'

ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায়, রঙিন এ বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায়–

লালে লাল পলাশ বন মন হলো আজ উচাটন, মন মেতেছে মহুল ফুলের বাসে, ও মোর সজনী গোপনে সে আমায় ভালোবাসে

পিদাড়ে পলাশের বন, পালাবো পালাবো মন, নেংটি ইঁদুরে ঢোল কাটে, কাটে হে, বতরে পিরিত ফুল ফুটে

বেহুরে লগণ, মধুরে লগণ, আকাশে বাতাসে লাগিল রে, চম্পা ফুটিছে চামেলি ফুটিছে, তার সুবাসে ময়না আমার ভাসিল রে, হলুদ বরণ মেঘলায় এ তার যৌবন উছলায়, লাল ওড়নার আড়াল দিয়া চক্ষু দুটি চায়, খোঁপায় টগর ময়না বুঝি আমায় খুঁজে হায়, বসন্তে এই বিহুর লগণ উত্তল হয়ি যায়

শাল তলে বেলা ডুবিল দিদি লিলো লো, শাল তলে বেলা ডুবিল

আজ ফাগুনী পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই, যেন ঢাক আছে, আর কাঠি নাই, তোরে ছাড়া আমার হালটা যে তাই, ভাবুক যা খুশি সবাই, এই ফাগুনী পূর্ণিমা রাতে চল পলায়ে যাই

অসংখ্য লোকগীতির মধ্যে একটি ঝুমুর গানের উপজীব্য বিষয় হচ্ছে তরুণ তরুণীর প্রেম ভালোবাসার কথা যখন সমাজে জানাজানি হয়ে কিংবা প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে যখন একটি মেয়েকে অপবাদ দেয়া হয় এবং মেয়েটি সমাজ ও লোকলজ্জার ভয়ে গলায় কলসি বেঁধে পুকুরে আত্মাহুতি দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। যেমন–

'তু কেনে কাদা দিলি, তু কেনে কাদা দিলি সাদা কাপড়ে, এখন হামার হবে কী, গাঁইয়ের লোকে কবে কী, মুখ মুছে তুই ঘর যাবি ওরে সিয়ানা, আমি কুথা কাদা ধুব দেখিনে দে না, কলসি দড়ি গলায় বেঁধে, মরবো ডুবে কোন পুকুরে ..।'

নজরুলের গানে ঝুমুরের প্রভাব

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক অভাব অনটনের কারণে তাঁর শিক্ষা জীবন বাধাগ্রস্ত হয় এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্র দশ বছর বয়সে আসানসোলের এক রুটির দোকানে কাজে নামতে বাধ্য হয়।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের বুক চিড়ে দামোদর নদীর বিস্তীর্ণ দুই কূলে বসবাস আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতির। নজরুলের বেড়ে ওঠা গ্রাম্য পরিবেশেই। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভিক বয়স কেটেছে এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে। নজরুলের বিভিন্ন আঙ্গিকের গানের মধ্যে 'ঝুমুর' অন্যতম। আদিবাসী ও সান্তাল অধ্যুষিত অঞ্চলের গান হলো 'ঝুমুর'। ছোটবেলা থেকেই ঝুমুর গানের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ঝুমুর গানের কথায় ও সুরে তিনি যে বৈচিত্র্য এনেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য।

নজরুল চমৎকারভাবে আদিবাসী ঝুমুর সুর তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। কারণ ঝুমুর গানের একটা জমজমাট আনন্দ আছে, একধরনের ছন্দ-দোলা আছে যা মনকে হঠাৎ খুশির আনন্দে মাতিয়ে তোলে। বাঁশি আর মাদল এই গানের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। নজরুলের সৃষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও বহুল পরিচিত ঝুমুর গান হলো–'এই রাঙ্গা মাটির পথে লো, মাদল বাজে বাজে বাঁশের বাঁশি', 'ঝুমঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলো গো সই লো দেখে আয়' এবং 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে ঘুঙুর বেঁধে গায়, নাচব দুজন মাদল, বাঁশি, নূপুর নিয়ে আয়'।

বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের গানে লোকগীতি ও ঝুমুরের প্রভাব

কবিগুরু সম্ভ্রান্ত এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও কথিত আছে যে, তিনি জমিদারি থেকে আসমানদারি করেছেন বেশি। শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী ও বিলাসিতা বিমুখ। তখন থেকেই তাঁর জীবনে লোকায়ত জীবনের সরলতা, সহজতা লক্ষ করা যায়। অবশ্য সে সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গ্রাম্য জীবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন–গাছগাছালি, বাগান, পুকুর, ঢেঁকিশালা, পাঠশালা, পালা পার্বণ, ব্রত, পূজা, আলপনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল তা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' বই দুটি থেকে জানা যায়।

১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল এই দশ বছর তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া, শিলাইদহ ও পতিসরসহ বীরভূমের নানা পল্লী অঞ্চলে। জমিদারি দেখাশোনার সুবাদে ঐ সব অঞ্চলে বসবাসকালে অগণিত লোকসংগীত ও বাউল শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। লোকসংগীতের বিভিন্ন ধারার গানের সুরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানে লক্ষ করা যায়। প্রথমে তিনি শিলাইদহ পোস্ট অফিসের পিয়ন গগন হরকরা (গগন দাস)-এর গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর রচিত ও গাওয়া গান 'কোথায় পাবো তারে/ আমার মনের মানুষ যেরে'–এই গানে মুগ্ধ হন। কেবল মুগ্ধই হয়ে ক্ষান্ত হননি, নিজে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'–এই বাণীর সঙ্গে গগনের গানের সুর যোজনা করেন।

কবিগুরুর অসংখ্য গানের মধ্যে প্রচলিত লোকসংগীত, ঝুমুর ও বাউল গানের সুর ও প্রভাব লক্ষ করা যায়। যেমন–গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে, দেখেছি রূপ সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে ও বন্ধু আমার, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে, আজি ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলা রে ভাই লুকোচুরির খেলা এবং আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকল খানে ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষের কথা শুরুর প্রসঙ্গে

ওপার বাংলার গীতিকার ও কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী ১৯৭২ সালে শ্রীরামপুর স্টেশনে ফুলের ভারে অলংকৃত একটি মহুয়া গাছ দেখে রচনা করেন একটি কবিতা, যা পরবর্তী সময়ে গান হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

‘ও তুই লাল পাহাড়ি দেশে যা, ও তুই রাঙা মাটির দেশে যা, হেথাক তুকে মানাইছে না রে, লাল পাহাড়ি দেশে যাবি, হাঁড়িয়া আর মাদল পাবি, মেয়ে মানুষের মরদ পাবি রে, ও নাগর হেথাক তুকে মানাইছে না রে।’

জল, জমিন ও জঙ্গল মহালের একটি বিখ্যাত গাছ মহুয়া এবং এর ফুলের নাম মহুল যা থেকে আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতির মানুষেরা সূরা বা মাদক তৈরি করে এবং এটি থেকেই মহুয়ার মাদকতা কাব্যিক শব্দটি বোধহয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

কবিগুরুর ছোট্ট একটি কবিতা আছে–‘বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপরে, একটি শিশিরবিন্দু।’ ছোট্ট সত্যজিৎ রায়কে লিখে উপহার দেয়া উপরের কবিতায় কবিগুরু তাঁর মাকে আরও বলেছেন যে, ‘এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে।’

আধুনিক বাংলার চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় কবিগুরুর কথা বুঝেছিলেন কি না জানি না তবে তাঁর ‘আগুন্তুক’ সিনেমাটি দেখলেই একটু ধারণা পাওয়া যায়। প্রায় তিরিশ বছর পর দেশে ফেরা মামা চরিত্রের তুখোড় অভিনেতা উৎপল দত্ত শহরের কৃত্রিম মানুষের স্বার্থবাদী ও ঠুনকো আচার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে কাউকে না জানিয়ে শান্তিনিকেতনের পাশে বনের পুকুর নামক কোল আদিবাসী গ্রামে প্রাণ ভরে বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের সত্তাকে ফিরে পান।

কবিগুরু ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে লালমাটির দেশ বীরভূমের অজয় নদীর তীরে বোলপুরের তপোবনে কবি তাঁর কর্মজীবন স্থানান্তর করেন। জাতীয় কবি নজরুলের আসানসোল এবং কবিগুরুর বোলপুর–এই দুটি স্থানের দূরত্ব মাত্র ১০০ কিলোমিটারেরও কম এবং দুটি স্থানই আদিবাসী অধ্যুষিত জল, জমিন ও জঙ্গল মহালের রাঙামাটির দেশে অবস্থিত।

অনেক গবেষণাপত্রে উল্লেখ আছে যে, কবিগুরু তাঁর জীবনের যে-দুটি সাধনার কথা তিনি বলেছেন, তার একটির কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এবং অন্যটি শ্রীনিকেতন। তিনি গ্রামীণ মানুষদেরকে দারিদ্র্য, অনাহার ও অশিক্ষা থেকে মুক্তি দেবার জন্য প্রতিষ্ঠা করলেন পল্লী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ। বাংলাদেশের

পতিসর-শিলাইদহতে যখন তাঁর গ্রামের মানুষের ভেতর নিবিড় বসবাস, তখনই ১৮৯৪ সালে, তিনি উচ্চারণ করেন তাঁর কর্তব্য-সংকল্প : 'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে/দিতে হবে ভাষা; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে/ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

পরিশেষে এই আগুন রাঙা ফাগুনে লাল আর হলুদের বাসন্তী রঙে ফাল্গুনের এই বসন্ত বরণ, রাঙামাটির পলাশ ও শিমুলের রাঙা আবির, মন আনচান করা কোকিলের উদাসী উচাটন এবং নানান রঙের ফুল ও পত্র-পল্লবে বিকশিত এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে কত অসংখ্য মানুষের অজানা দুঃখ, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, চোখের নোনা জলের অশ্রুবিন্দু ও বেদনার নীল কাব্য লুকিয়ে আছে তা অজানাই থেকে যায়!

জীবনের নবায়নে এই বসন্তে নানান রঙের উৎসব

এই অপরূপ প্রকৃতির পালা বদলের লীলা খেলায় আগুন রাঙা ফাগুন মাস থেকে বৈশাখ মাস (ইংরেজি ফেব্রুয়ারি থেকে মে) পর্যন্ত এই সবুজ শ্যামল বাংলার জন-জীবনে আসে নানান রঙের উৎসব। প্রকৃতির রঙ, রূপ, গন্ধ ও বর্ণের পট পরিবর্তনের সাথে মানুষের জীবনেও লাগে উৎসবের ছোঁয়া। এর মধ্যে কোনোটা আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ ও কোনোটা সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি নীতির অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বাংলার মানুষ তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী মনের মাধুরী মিশিয়ে এই বসন্তে নানান রঙের উৎসব পালন করে থাকে যেমন–ফাল্গুনের বসন্ত বরণ উৎসব, দোল পূর্ণিমা ও হোলি উৎসব, মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা, ইস্টার সানডে (পুনরুত্থান পর্ব) ও সূর্যোদয় উপাসনা, পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব, সমতলে বাহা (ফুলের) উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব। এই সব উৎসবের আনুষ্ঠানিকতায় পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে মিল অন্তর্নিহিত; তা হচ্ছে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনেও ইতিবাচক পরিবর্তন ও জীবনের নবায়নের বার্তা বহন ও প্রেরণ।

আগুন রাঙা ফাল্গুনের বসন্ত বরণ উৎসব

শীতের জড়তা ও রুক্ষতাকে বিদায় জানিয়ে পহেলা ফাল্গুনের হাত ধরে ঋতুরাজ বসন্তের আগমন। আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অপরিহার্য সংস্কৃতির অংশ আগুন রাঙা ফাল্গুনের এই বসন্ত বরণ উৎসব। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৮৫ সালে মুঘল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। নতুন বছরকে কেন্দ্র করে তিনি ১৪টি উৎসবের প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বসন্ত উৎসব। বাংলার নিসর্গ প্রকৃতি বসন্তের আগমনে বর্ণিল রূপ ধারণ করে। নানান রঙের ফুল ও পত্র-পল্লবে বিকশিত হয়ে ওঠে এই ঋতুরাজ বসন্ত। তাই ফাগুনের এই মন-মাতানো উৎসবকে কখনও ফুলেল বসন্ত, মধুময় বসন্ত, যৌবনের উদ্দামতা বয়ে আনার

বসন্ত আর আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও উদ্বেলতায় মন-প্রাণ কেড়ে নেয়ার দিন হিসেবে অভিহিত করা হয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রকৃতির রূপ ও বর্ণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাল আর হলুদের বাসন্তী রঙে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের সাজিয়ে বসন্তের উচ্ছলতা ও উন্মাদনার এই উৎসব বাঙালির জীবনের নবায়নে সর্বজনীন প্রাণের উৎসব হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়।

দোল পূর্ণিমা ও হোলি উৎসব

দোল পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা সনাতন ধর্মানুসারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব। রঙের উৎসব দোল ও হোলি যতটা ধর্মীয়, ততটাই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎসব। বসন্তের রঙের সঙ্গে এই উৎসব আরও রঙিন হয়ে ওঠে। দোল উৎসবের অনুষঙ্গে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে দোল পূর্ণিমা বলা হয়।

হিন্দু ধর্ম মোতাবেক, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অষ্টম অবতার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২৮ সালে যার জন্ম) অর্থাৎ অদৃশ্য ভগবানের মানব সদৃশ হলো শ্রীকৃষ্ণ। বৈষ্ণব বিশ্বাস অনুযায়ী, ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির বা গুলাল নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সঙ্গে রঙ খেলায় মেতেছিলেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক গানে দোল ও রাধা-কৃষ্ণের দোল লীলার তাৎপর্য আছে। দোলযাত্রা উৎসব শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব নামে পরিচিত। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গানেও হোলি বারবার এসেছে। দোল বা হোলি দুটোই রঙের খেলা হলেও কিন্তু এই দুটি ভিন্ন অনুষ্ঠান। দোল আগে উদযাপিত হয় তারপর হোলি। দোলযাত্রা বা বসন্তোৎসব একান্তভাবেই সনাতন বাঙালির নিজস্ব উৎসব। আর হোলি অ-বাঙালিদের উৎসব।

বসন্তের ছোঁয়ায় যখন মন রঙিন, তখন হোলির রঙে নিজেকে মাখিয়ে নতুনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়াই এই উৎসবের সৌন্দর্য। পুরনো দুঃখ-কষ্ট, শত্রুতা ভুলে নতুনভাবে পথ চলতে শেখায় দোল বা হোলি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য–এই ছয় রিপুকে জয় করার উৎসবই দোল।

মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের কাছে মাঘী পূর্ণিমা ও বৈশাখী পূর্ণিমা ঐতিহাসিক

দিন ও যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই তিথি উদযাপন করা হয়। কথিত আছে যে, মাঘী পূর্ণিমার রাতে মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ তার মহাপরিনির্বাণের দিন ঘোষণা করেন। মাঘী পূর্ণিমার তিথিতে তথাগত বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু সংঘের কাছে বলেন যে–উৎপত্তি ও বিলয় জগতের নিয়ম। উৎপত্তি হয়ে নিরুদ্ধ হওয়া জাগতিক ধর্ম। এই মহাসত্যটি জীবন ও জগতের সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি আরও বলেন, জগতের সংস্কারসমূহ ক্ষয়শীল, ধ্বংসশীল। অতএব তোমরা অপ্রমাদের সঙ্গে নির্বাণ সাধনা করিও। ওই দিন থেকে পরবর্তী তিন মাস পর শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে নিজ দেহ ত্যাগ করবেন। আর সেটাই হয়েছিল। এ কারণে এদিন সব বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ ইহকাল ও পরকালের সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্যান সমাধি করেন এবং জীবনকে শীলময়, ভাবনায় ও বিশুদ্ধ করার জন্য কঠোর সংকল্পে ব্রতী হন।

গৌতম বুদ্ধের শুভজন্ম, বোধিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভ এই ত্রি-স্মৃতি বিজড়িত বৈশাখী পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বিশ্বের সকল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর কাছে এটি বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এই বৈশাখী পূর্ণিমাতেই বুদ্ধের তিনটি স্মরণীয় ঘটনা রয়েছে। এই বৈশাখী পূর্ণিমার রাতেই রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে কঠোর সাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তপস্যার মাধ্যমে যেদিন বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। বুদ্ধত্ব লাভের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে যেদিন তিনি মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যুবরণ) লাভ করেছিলেন সেদিনও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। গৌতম বুদ্ধ মাত্র ৮০ বছর বয়সে তৎকালীন মল্ল রাজ্যের রাজধানী কুশিনগরে প্রাণ ত্যাগ করেন, সেই ঘটনাটিকে বুদ্ধিষ্টরা 'মহাপরিনির্বাণ' নামে অভিহিত করে থাকেন।

এই দুটো মঙ্গলময় পূর্ণিমার রাতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বশান্তি কামনায় বিশেষ সূত্রপাঠের আয়োজন করে এবং 'অহিংস পরম ধর্ম' বুদ্ধের এই অমিয় বাণীকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের এবং বিশ্বের সকল প্রাণীর হিতসুখ ও মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করে।

ইস্টার সানডে (পুনরুত্থান পর্ব) ও সূর্যোদয় উপাসনা

পবিত্র বাইবেল মতে, ইহুদিরা ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিষ্টকে তৎকালীন রোম সম্রাট টাইবেরিয়াসের অধীনস্থ জুদেয়া (প্যালেস্টাইন) অঞ্চলের শাসনকর্তা পিলাতের শাসন আমলে মধ্যযুগীয় কায়দায় ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে।

যীশু খ্রিষ্ট মৃত্যুর তৃতীয় দিনে অর্থাৎ রবিবারে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) মূলত বাইবেল কেন্দ্রিক। পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে যা লেখা আছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

এই দিন মরিয়ম মগদালিনি নামক এক নারী যীশুর কবরে যান। বাইবেলে যে সময়টার বিবরণ দেওয়া আছে তা হলো–রবিবার খুব ভোরে (মথি ২৮:১), খুব ভোরে (লুক ২৪:১), রবিবার দিন সকাল সকাল তখনও অন্ধকার ছিল (জন ২০:১) এবং ভোরে, ঠিক সূর্য ওঠার পর (মার্ক ১৬:২)। সুতরাং যীশু খ্রিষ্ট যে সকল প্রকার দুঃখ, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও অন্ধকার ঘুচিয়ে সূর্যের আলোর সাথে পুনরুত্থান করেছেন তা খুবই স্পষ্ট। তাই সময় ও মাহেন্দ্রক্ষণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর সূর্যোদয় উপাসনা (সানরাইজ সার্ভিস) খ্রিষ্টের পুনরুত্থানেরই জয়গান, যা আনন্দঘন পরিবেশে বিশ্বব্যাপী উদযাপন করা হয়।

পাহাড়ে বৈসাবি উৎসব

বৈসাবি হচ্ছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার প্রধান তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সমাজের বর্ষবরণ উৎসব। এটি তাদের প্রধান সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর একটি। এই উৎসবটি ত্রিপুরাদের কাছে বৈসু, মারমাদের কাছে সাংগ্রাই এবং চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের কাছে বিজু নামে পরিচিত। বৈসাবি নামকরণও হয়েছে এই তিনটি উৎসবের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে। যেমন, 'বৈ' শব্দটি ত্রিপুরাদের বৈসু থেকে, 'সা' শব্দটি মারমাদের সাংগ্রাই থেকে এবং 'বি' শব্দটি চাকমাদের বিজু থেকে নেওয়া হয়েছে। বৈসাবি কিন্তু একক কোনো অনুষ্ঠান নয়। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ পার্বত্য অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি জনগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস থেকে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে জড়িত থাকে তাদের নিজেদের প্রথা ও সংস্কার। চৈত্র মাসের শেষ দুটি দিন এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন এই তিন দিন অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

এই বৈসাবি উৎসবের মাধ্যমে পাহাড়ি জাতি গোষ্ঠী পুরনো বছরকে বিদায় এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানায় এবং নানান রকমের বৈচিত্র্যময়

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যেমন–নদী থেকে কলসি ভরে পানি এনে গুরুজনদের গোসল করানোর মাধ্যমে আশীর্বাদ গ্রহণ এবং জলকেলি উৎসব। এই উৎসবে আদিবাসীরা সবাই সবার দিকে পানি ছুড়ে উল্লাসে মেতে ওঠে যেন গত বছরের সব দুঃখ, পাপ ধুয়ে যায় এবং নতুন বছরে সবার জীবনে যেন নবায়ন ও পরিবর্তন আসে।

সমতলে বাহা (ফুলের) উৎসব

বাংলাদেশের সমতলের আদিবাসী সান্তালদের কাছে বাহা বা ফুলের উৎসব একটি অন্যতম প্রধান উৎসব। বাহা শব্দের আক্ষরিক বাংলা অর্থ ফুল। সে জন্যই বাহা উৎসবকে ফুল বা বসন্ত উৎসব নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। দোল পূর্ণিমার পর চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রতিটি সান্তাল গ্রামে বাহা উৎসব পালিত হয়। শাল পলাশ ফুল ফোটার সাথে সাথেই বাহা উৎসবের আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়। পুরনো পাতা ঝরে যাওয়ার পর নতুন পাতা ও ফুল দিয়ে যখন প্রকৃতি ভরে ওঠে তখনই সান্তাল গ্রামে গ্রামে বাহা উৎসবের সাড়ম্বর ঘোষণা শুরু হয়। মহুল (মহুয়া) ফুলের কুঁড়ি উদ্গামের সাথে সাথেই যুবক-যুবতীদের মধ্যে উৎসব পালনের প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রকৃতি যখন নতুন সাজে সেজে ওঠে শাল পলাশের রঙে ও গন্ধে তখন প্রকৃতির পূজারি আদিবাসীদের মধ্যেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়।

এই উৎসবের দিনে যুবক-যুবতীগণ নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে নায়কে বা পুরোহিতকে নতুন কুলার আতপ চাল, শাল ফুল, মহুয়া ফুল প্রভৃতি নিয়ে পূজাস্থলে নিয়ে আসে। পুরোহিত শাল ও মহুয়া ফুল এবং নতুন ফুল দেব-দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করে। পূজা সমাপ্ত হলে নাচতে নাচতে যুবক-যুবতীগণ পুরোহিতকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেওয়ার পথে প্রতিটি বাড়ির দরজায় বাড়ির মেয়েরা পুরোহিতের পা ধুইয়ে দেয়। পুরোহিত তার ডালা থেকে প্রতিটি বাড়িতে পূজার নতুন ফুল দেন। এই উৎসবের বিশেষত্ব হচ্ছে, বাহা পূজা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো মেয়ে খোঁপায় নতুন ফুল গুঁজবে না। সে জন্য অত্যন্ত পবিত্রতার সাথে বাহা পূজা বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত বাহা উৎসবে সান্তাল গ্রামের যুব বৃদ্ধ সবাই মেতে ওঠে। বাহা উৎসবের মধ্য দিয়েই নতুন ফুল, ফল ও পাতার ব্যবহার সান্তাল সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব

আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অপরিহার্য সংস্কৃতির অংশ বাংলা নববর্ষ বরণ। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৫৮৫ সালে মুঘল সম্রাট আকবর প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। তখন থেকেই বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব বাঙালির সর্বজনীন প্রাণের উৎসব হিসেবে বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ' গানটি বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের প্রধান একটি গান, যা ছাড়া পহেলা বৈশাখের যে কোনো অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় না। বাংলাদেশে ঢাকার রমনা বটমূলসহ বিভিন্ন স্থানে পহেলা বৈশাখকে স্বাগত জানানো হয় ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। এই আনন্দের দিনে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন সংগঠন লক্ষ্মী পেঁচা, বাঘ, সিংহ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রা ও নানান রকমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মেলা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষকে বরণ করে থাকে।

বাংলা বছরের প্রথম দিনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সকল জাগতিক ও মনো-জাগোতিক সকল অন্ধকার দূর করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং আমাদের চিন্তা, মনন, দর্শন ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন ভেঙে জীবনের নবায়ন ও জীবনে নতুনত্ব আনার জন্য অঙ্গীকার করে থাকি।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলা নববর্ষের চেতনার অনুরণন

অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যময় প্রকৃতির পালা বদলের লীলা খেলায় আগুন রাঙা ঋতুরাজ বসন্তের ফাল্গুন মাস থেকে গ্রীষ্মের রানী বৈশাখ মাস (ইংরেজি ফেব্রুয়ারি থেকে মে) পর্যন্ত এই সবুজ শ্যামল বাংলার জন-জীবনে আসে নানান রঙের উৎসব। বাংলার নিসর্গ, প্রকৃতির রঙ, রূপ, গন্ধ ও বর্ণের পট পরিবর্তনের সাথে মানুষের জীবনেও লাগে উৎসবের ছোঁয়া। আবহমান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য ও অপরিহার্য সংস্কৃতির অংশ হচ্ছে বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব। বাংলার ঐতিহ্যময় ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ একটি আদেশনামার মাধ্যমে প্রথম বাংলা নববর্ষ গণনা শুরু করেন। মূলত খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলা সন প্রবর্তন করা হয়। কেননা তখনকার দিনে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে কৃষকদের খাজনা ও শুল্ক দিতে হতো। সেই থেকে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব বাঙালির সর্বজনীন প্রাণের উৎসব হিসেবে বর্ণিল উচ্ছলতা ও উন্মাদনায় বিশ্বব্যাপী উদযাপিত হয়।

বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান বাংলার চিরাচরিত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি নীতির অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো' গানটি বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসবের প্রধান একটি গান যা ছাড়া পহেলা বৈশাখের যে কোনো অনুষ্ঠান পূর্ণতা পায় না। প্রতিবছর বাংলাদেশে ঢাকার রমনার বটমূলে ১৯৬৬ সাল থেকে শুরু হওয়া পহেলা বৈশাখকে স্বাগত জানানোর জন্য ছায়ানটের সূর্যোদয়ে গানের অনুষ্ঠান এখনও চলমান। ১৯৮৯ সাল থেকেই মঙ্গল শোভাযাত্রা বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের একটি প্রধান আকর্ষণ। এই আনন্দের দিনে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গ্রামীণ সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্মী পেঁচা, বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মুখোশ পরে মঙ্গল শোভাযাত্রা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালে ইউনেস্কো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে আয়োজিত মঙ্গল

শোভাযাত্রাকে 'মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষাণা করে। এ ছাড়াও পহেলা বৈশাখের অনুষঙ্গ হচ্ছে, শত বছরের ঐতিহ্য গ্রাম্য মেলা ও হালখাতা এবং ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু হওয়া পান্তা ইলিশ সংস্কৃতি। বাঙালি বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, তাঁরা প্রতিবছর নানান রকমের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মেলা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষকে সাদরে বরণ করে থাকে। এই সব উৎসবের আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি আমরা বাংলা বছরের প্রথম দিনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে আমাদের সকল জাগতিক ও মনো-জাগতিক সকল অন্ধকার দূর করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করি এবং আমাদের চিন্তা, মনন, দর্শন ও কূপমণ্ডূকতার অচলায়তন ভেঙে জীবনের নবায়ন ও জীবনে নতুনত্ব আনার জন্য অঙ্গীকার করে থাকি। একইভাবে সকল ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষদের নিয়ে একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ, মিলন, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পৃথিবী গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করি।

বাঙালি বীরের জাতি। বাঙালির রয়েছে সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও ধর্মের ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া বিভক্তির ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়। জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশে মুসলিম লোকসংখ্যা বেশি হওয়াতে তা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ ও প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকেরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বাংলার জনগণের উপর অত্যাচার ও নানারকম বৈষম্য প্রদর্শন করত। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী সারা দেশে পরাজিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪.৩১ মিনিটে ঢাকার রমনা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। এরই মাধ্যমে নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয় এবং বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় লাল সবুজের পতাকা সংবলিত বাঙালি জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাষার জন্য রয়েছে বাঙালির অপরিসীম অবদান। মাতৃভাষা বাংলার জন্য সংগ্রাম, রক্ত ও জীবন দেয়ার ইতিহাস একমাত্র বাংলাদেশের রয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ইতিহাসে নেই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত ও মাইলফলক

হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর সর্বপ্রথম ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে পৃথিবীব্যাপী প্রচলিত সব ভাষা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুজাতিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার জন্য একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

বর্তমানে আমরা অনেকেই অভিবাসী হয়ে আমেরিকার উত্তর-পূর্বে সংবিধান রাজ্য (The Constitution State) কানেকটিকাটে বসবাস করি। এখানে একটি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন যে, আমেরিকার সংবিধানে কীভাবে বহুজাতিক ভাষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সহনশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুচনা হয়। ১৬৩৯ সালে কানেকটিকাট কলোনি সর্বপ্রথম একটি মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা আমেরিকার স্বাধীনতার চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করে বিধায় কানেকটিকাটকে ১৯৫৯ সাল থেকে সংবিধান রাজ্য বলা হয়। ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পর, ১৭৮৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার সংবিধান গৃহীত হয়। আমেরিকার সংবিধানের স্থপতি হলেন জেমস মেডিসন, টমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জর্জ ওয়াশিংটন। কথিত আছে যে, আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাগণ, বিশেষ করে টমাস জেফারসন ২৬০০ বছর আগের পারস্যের সাইরাস সিলিন্ডার (Cyrus Cylinder) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে পারস্যের রাজা সাইরাস ছিলেন অত্যন্ত সুবিবেচক, যার রাজ্য মেসোপটেমিয়া থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনিই একমাত্র পারস্য অঞ্চলের রাজা ছিলেন, যার শাসনামলে কোনো বিশেষ ধর্মের আধিপত্য ছিল না বরং বহু ভাষার ও বহু জাতির লোকজন নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি নির্ভয়ে পালন করতে পারত। রাজা সাইরাস সকল দাসকে মুক্ত করেছিলেন, সকল মানুষের পছন্দমতো ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং জাতিগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই জন্যই সাইরাস সিলিন্ডার (Cyrus Cylinder)-কে বিশ্বের প্রথম মানবাধিকার সনদ (Human Rights Charter) নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এক কথায়, রাজা সাইরাস বহু ভাষার ও বহু জাতির সমন্বয়ে একটি সহনশীল, একতাবদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

(রাজা সাইরাস পোড়া মাটির সিলিন্ডারের উপর আকাদিয়ান ভাষায় মানবাধিকার সনদ খোদাই করে রাখেন)

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, টমাস জেফারসনের কাছে দুই সেট সাইরোপেডিয়া (Cyropaedia) ছিল যা মুলত রাজা সাইরাসের জীবন কাহিনি। এই সাইরোপেডিয়া (Cyropaedia) লিখেছিলেন জেনোফোন যিনি কিনা খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাগণ গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার অনেক ঐতিহাসিক বই পড়েছিলেন তার মধ্যে সাইরোপেডিয়া (Cyropaedia) ছিল অন্যতম। অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আমেরিকার সংবিধানের স্থপতিগণ অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি অন্যতম রাজা সাইরাসের বহুজাতি ভিত্তিক একটি সহনশীল, একতাবদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সমাজ কাঠামো পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমেরিকার সংবিধান রচনা করেন। এর একটি প্রমাণ হলো, ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ জাদুঘরের একটি প্রত্নতত্ত্ব দল ইরাকের অভ্যন্তরে সাইরাস সিলিন্ডার (Cyrus Cylinder)-এর রেপ্লিকা আবিষ্কার করে এবং তা বর্তমানে ওয়াশিংটন ডিসি জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষিত আছে। খুব সম্ভবত এর ধারাবাহিকতায়, পারস্যের ইরানি পার্লামেন্ট মজলিস (২৯০)-এ ৫টি আসন সংরক্ষিত আছে সংখ্যালঘু জনগণের জন্য (আরমেনিয়ান খ্রিষ্টান-২, আসিরিয়ান খ্রিষ্টান-১, জরাষ্ট্র-১)। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, যে ইসরায়েলের সাথে ইরানের বৈরী সম্পর্ক সেখানে মাত্র দশ হাজার (১০,০০০) ইহুদির জন্য ইরানি পার্লামেন্ট মজলিসে একটি (১) আসন সংরক্ষিত আছে!

বর্তমানে চলমান ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের ফলে পুরো আরব বিশ্বেই এক অচলাবস্থা বিরাজ করছে। অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মণ্ডিত এই অঞ্চলে রয়েছে অনেক প্রাকৃতিক নদ-নদী ও ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং অনেক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান যেমন–জর্ডান নদী, গালিল সাগর ও মৃত সাগর এবং অনেক পাহাড় ও উপত্যকা। পৃথিবীর আশীর্বাদময় এক অঞ্চল যেখানে রয়েছে বাইবেল ও কোরআনের বিখ্যাত চরিত্র আব্রাহাম, ইসাহাক, মোশী ও দাউদের আবাসস্থল ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান। যীশু খ্রিষ্টের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বাণী প্রচার ও মৃত্যু হয় এই এলাকায়। তাই জেরুজালেম খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ফলে অবিরত সেখানে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। প্রায় ৭০ বছর ধরে সেখানে চলছে মানবিকতার এই বিপর্যয়। গত বছর ৭ই অক্টোবর ২০২৩ ভোরবেলা হামাস ইসরায়েল আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন

ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই প্রাণঘাতী যুদ্ধে এ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন-গাজার প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার এবং ইসরায়েলের প্রায় আড়াই হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই মুহূর্তে প্যালেস্টাইন-ইসরায়েলসহ যে কোনো স্থানে অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় ও সকল ধর্মের মানুষের আবাসস্থল এই ধরিত্রীর বুকে মানবিকতার বিপর্যয় আরও ঘটতেই থাকবে!

পরিশেষে বলতে চাই যে, বর্তমান বিশ্বের আর একটি প্রতিঘাত হচ্ছে পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন ও জীব বৈচিত্র্যের বিলোপ সাধন। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, নির্বিচারে গাছ নিধন, ভোগবাদী জীবন যাপন, পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর নিদারুণ অবহেলার কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে তাপ প্রবাহ বৃদ্ধি, দীর্ঘস্থায়ী খরা, অসময়ে অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ ক্রমাগত বাড়ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সাগরের জলসীমা বাড়ছে এবং বিশ্বের উপকূলীয় দেশ বাংলাদেশসহ অনেক দেশ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা যদি ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকে তাহলে অনেক দেশ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং জলবায়ু ও পরিবেশ উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। এক সময় ষড় ঋতুর বৈচিত্র্যময় দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছিল ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা সবুজ শ্যামলিমায় আবৃত নান্দনিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। কালের পরিবর্তনে প্রকৃতির উপর আমাদের লাগামহীন অত্যাচার, ভোগবাদী জীবন আচরণে অতিমাত্রায় আসক্তি ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য বিলুপ্তির সাথে হারিয়ে যাচ্ছে জলবায়ু ও আবহাওয়ার গতি প্রকৃতি এবং নানান জাতের দেশজ ধান, উদ্ভিদ, ফুল, ফল ও পাখি। আজ যেখানে মধ্যপ্রাচের আরবের মরুর বুকে বৃষ্টি ও বন্যা হয় সেখানে আমাদের চোখের নোনা জলে বৃষ্টির জন্য হাহাকার ও প্রার্থনা করতে হয়। তাই পরিবেশের প্রতি যত্নশীল ও পরিবেশবান্ধব জীবন যাপন করতে না পারলে আমাদের চিরচেনা সবুজের দেশ একদিন ঊষর বিরান ভূমিতে পরিণত হতে আর খুব বেশি দেরি নেই!

‘কারার ঐ লৌহ কপাট’ গানটির সুর নয় বরং চেতনা ও অনুপ্রেরণার কথাই বলি

এ নিয়ে অনেক প্রতিক্রিয়া আমি পড়েছি। তবে আমি ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটা বলতে পারি যে কোনো কবি, সাহিত্যিক ও লেখকের কাজ হচ্ছে একটি মতাদর্শ প্রচার করা। যদিও এই দার্শনিক ভাবনা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে এক এক রকম হতে পারে।

আমরা সবাই জানি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’ গানটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। আমি গানটির সুর নয় বরং গানটির মধ্যে যে সংবাদ/চেতনা ও অনুপ্রেরণা লুকিয়ে আছে এবং এর উপযোগিতা যে এখনও আছে সেটার কথাই বলছি।

আর একটি উদাহরণ দেই–ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার নায়ক মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন (Non-Violence Movement) ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৩ সালে আমেরিকায় মারটিন লুথার কিং নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) করেন এবং এর ফলে আমেরিকার কালো মানুষেরা আইনগতভাবে সমান নাগরিক অধিকার লাভ করে। সুতরাং এখানে দার্শনিক চেতনা ও মতাদর্শই মুখ্য!

তবুও আমি আশাবাদী যে, এপার-ওপার বাংলা ছাড়াও পৃথিবীর অনেক জায়গায় আমাদের জাতীয় কবির দর্শন ও মতাদর্শ এখনও যে দরকারি ও প্রাণবন্ত এবং মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, বন্দিত্ব ও অসহায়ত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য গানটির এবং গানের কথাগুলোর মধ্যে যে সংবাদ/চেতনা পরিবেশন করা হয়েছে তার অনেক উপযোগিতা রয়েছে। এজন্য আমি আমাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে আরও বেশি গর্ব করি। কেননা তাঁর চিন্তার বিশালতা, দর্শনের গভীরতা অনেক ব্যাপক এবং সুদরপ্রসারী!

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতাটিই তার একটি সাক্ষ্য :

'বল বীর

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির

বল বীর

বল মহা বিশ্বের মহাকাশ ফাঁড়ি

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি

ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া

খোদার আসন আরশ ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর!'

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর চিন্তা, চেতনা ও দর্শনের আলোকে পৃথিবীর কোথাও যদি মানুষ অজ্ঞতা, অন্ধতা, অজ্ঞানতা, অন্ধকারচ্ছন্নতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি পায় এবং তাঁর সংগীত ও সাহিত্যকর্মের আলাকে পৃথিবীর কোথাও যদি মানুষ দুঃখ, দুর্দশা, বন্দিত্ব ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পায়–আমি মনে করি সেটাই আমাদের জাতীয় কবির বিশালত্ব ও মহত্ত্ব!

তাই আমি গানটির সুর নয় বরং চেতনা ও অনুপ্রেরণার কথাই বলি। কেননা সুরের নোটেশন দিয়ে চিন্তা, চেতনা, মতাদর্শ ও দর্শনের বিশালত্বকে কখনো অচলায়তনে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না!

রূপান্তরিত পৃথিবীর শিশু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ : আমার মন্তব্য

রূপান্তরিত পৃথিবীর শিশু
সাম্যসাথী ভৌমিক
করজোড়ে ক্ষমা চাই, তোমাদের কাছে।
সুকান্ত, তোমাকে বলি–
নবজাতকের কাছে আমাদের
নেই কোনো অঙ্গীকার।
গোল্লাছুট, ছুটি নিয়ে
গেছে চলে হোমওয়ার্ক খাতায়;
বউচুরি খেলা হয় জি-বাংলায়;
আমরা পারিনি দিতে সে পৃথিবী–
যেখানে মানুষে মানুষে কিছু কথা হয়।
চারিদিকে আলোড়ন–পুতুলের মতো শিশু চাই।
জননীর কোলে আজ রোবটের ঠাঁই।
এরপর–
রোবটে-রোবটে হবে আসল লড়াই;
যদি হয় মানুষের পরাজয়, তাই পাই ভয়।

আমার এই পর্যন্ত কবি বন্ধু Samyasathee Bhowmik-এর বেশ কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বন্ধুবর Bidhan Chowdhury-এর অনুবাদটি আমার কাছে ভোরের মৃদু বাতাসের মতো–যা

দেহ ও মনে এক প্রশান্তির আমেজ এনে দেয়। যে কোনো অনুবাদকর্ম অত্যন্ত জটিল, সময় সাপেক্ষ ও মূল রচনার ভাবগত অর্থ এবং তাৎপর্য অক্ষুণ্ন ও সমুন্নত রাখার জন্য উভয় ভাষার উপর প্রচুর দক্ষতা, কাব্যিক জ্ঞান ও পরিমিত সৌন্দর্য বোধ থাকতে হয়। অনুবাদকারী প্রখর মেধাবী এবং আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহপাঠী। বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের উপর তার অগাধ পাণ্ডিত্য, মননশীলতা, সৃজনশীলতা ও জীবনের প্রতি সূক্ষ্ম রসবোধ, যা আমাকে সবসময় মুগ্ধ করে। কেননা বাংলা ও ইংরেজির কোনোটাই আমার মাতৃভাষা নয়!

এই কবিতায় অনুবাদকারী বন্ধু সহজ, সরল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে পাঠকদের দরজায় কড়া নাড়ার কাজটি তার পরিপাটি-পেশাগত দায়িত্বশীলতার স্বাক্ষর বহন করে। আমি এই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছিলাম। হয়তোবা, আমার বাংলা ও ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের উপর যথেষ্ট দক্ষতা না থাকার কারণেও হতে পারে! অনুবাদকারী বন্ধু সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, খুশির ঠ্যালায় বেমালুমভাবে মূল কবিতার প্রথম লাইন 'করজোড়ে ক্ষমা চাই, তোমাদের কাছে।' ভুলে গেছে- যা সাধারণ জনগণের উদ্দেশে কবির আর্জি–এই নিদারুণ ও বেমানান অনুপস্থিতি আমাকে আশাহত করেছে! সবচেয়ে যে বিষয় আমাকে আশ্চর্য করেছে তা হলো অনুবাদকারী বন্ধুর Gender Neutrality। মূল কবিতার লাইন 'যেখানে মানুষে মানুষে কিছু কথা হয়।'–এটির অনুবাদ করেছে–'গধহ ঃধষশরহম ঃড় গধহ'. আমার কাছে, এখানে 'মানুষে মানুষে' অর্থাৎ জনগণ বা চবড়ঢ়ষব শব্দটি বেশি সমীচীন। যেমন–People hardly talk to each other. আসলেও তো তাই–ডিজিটাল-যান্ত্রিক যুগে পরিবারের সব সদস্যের কাছে এক একটি ডিভাইস। কেউ কারো সাথে কথা বলে না! ইংরেজি গধহ একটি পুরুষ বাচক শব্দ। আবারও, মূল কবিতার লাইন– '...পুতুলের মতো শিশু চাই।'-এর অনুবাদ করেছে–Robotic Boy. এভাবেই অনুবাদকারী বন্ধু মনের অজান্তে কিংবা বেখেয়ালে পাঠকদের কাছে একজন কট্টর পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন (patriarchal perspectives/male chauvinism) একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেছে! আমার কাছে শিশু একটি নিরপেক্ষ শব্দ–যা ছেলে অথবা মেয়ে শিশুও হতে পারে। পরিশেষে কবি বন্ধু ও অনুবাদকারী বন্ধু–দুই জনের প্রতি শুভ কামনা নিরন্তর

‘জলজ’ কবিতার একটি পর্যবেক্ষণ

জলজ
তরণী টালমাটাল–বাজছে সানাই।
কয়েকজন সুবেশী যুবক,
কয়েকজন সুবেশী যুবতী;
তরণী টালমাটাল–বাজছে সানাই।
ঘাট কত দূর
বলো, ঘাট কত দূর?
চিকন জলের বাতাস বেঁধে বুকে–যেন তীর।
বলো ঘাট কত দূর?
শোনো বাজছে সানাই।
সুবেশী যুবক-যুবতী–বড়ো মিহি সুরে
ভেঙে ঢেউ গাইছে জলের গান।
তরণী টালমাটাল–বাজছে সানাই।
ঘাট কত দূর
বলো না, ঘাট কত দূর?

২৫. ০৭.২০২১
ঝিলটুলী, ফরিদপুর।

কবি বন্ধু Jibitesh Chandra Biswas-এর জলজ কবিতাটি একটি চতুর্দশপদী (সনেট) কবিতা। ছন্দের মিল-অমিল মিলিয়ে মিশ্র প্রকৃতির একটি কবিতা। আমি কবিতা বোদ্ধা নই, নিদেন পক্ষে কবিতার একজন পাঠক। এই কবিতাটি বিশ্লেষণ করা আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে একটি অসম্ভব কাজ। তবুও অন্ধের হাতি দেখার মতো হাতির লেজ ধরে হাতিকে দেখার

মতো এই কবিতাটি বিচার-বিশ্লেষণ করার দুঃসাহসের লোভ সংবরণ করতে পারছি না। বাকিটা কবির সম্মতি-অসম্মতির উপর এর সার্থকতা ও যথার্থতা নির্ভর করবে!

ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে বাংলাদেশের ফরিদপুরের ঝিলমিল করা কোনো এক ঝিলের পাড়ে কবিতাটি লেখা। কবিতার শিরোনাম জলজ অর্থাৎ যা কিছু জলে জন্মে হলেও মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী বা জলজ উদ্ভিদের বিবরণ বা অস্তিত্ব এই কবিতায় নেই। কবিতার প্রথম স্তবক চোখের সামনে দৃশ্যমান এক চিত্রপটের অবতারণা করে। একটি তরণী অর্থাৎ নৌকা টালমাটাল বা বেসামাল। নৌকার উপরে একদল তরুণ-তরুণী অত্যন্ত সুন্দর সাজে সজ্জিত। সানাইয়ের সুর যা সাধারণত দেশের চিরাচরিত ঐতিহ্যগতভাবে বিয়ের সময় বেশি ব্যবহার করা হয়। নৌকার তরুণ-তরুণীরা উত্তাল আনন্দে মশগুল। তাই নৌকা টালমাটাল বা বেসামাল। তাদের কথোপকথন ও জিজ্ঞাসা একটাই যে, ঘাট বা গন্তব্য কতদূর। তা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, সদ্য বিবাহিত কপোত-কপোতী যুগল ও সঙ্গী-সাথিরা বরের বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। সেই সাথে ঢেউয়ের তালে তালে মিহি সুরেলা কণ্ঠে গাইছে জলের গান।

এই কবিতাটি লেখার সময় কাল নিচে উল্লেখ থাকলেও কবিতাটির একটি লাইন–'চিকন জলের বাতাস বেঁধে বুকে' বলে দেয় শীত সমাসন্ন। কেননা উত্তুরে হিমেল হাওয়া মানুষের বুকে ও শিরদাঁড়ায় চিকন বা সূক্ষ্ম হিমেল অনুভূতি সৃষ্টি করে। কবিও যে একজন চিকন বা সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা না! এই কবিতাটিতে ঘাট বা গন্তব্য কতদূর–এ ধরনের জিজ্ঞাসা বারবার অর্থাৎ পাঁচবার করা হয়েছে। এখানে পাঁচ একটি গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক সংখ্যা, যা মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। হয়তোবা পাঁচ সংখ্যাটি কবির অন্যতম পছন্দের সংখ্যা! যেমন পাঁচ-এ, পঞ্চবাণ (সম্মোহন-উন্মাদন-শোষণ-তাপন-স্তম্ভন), পঞ্চনদ, পঞ্চতট ও পঞ্চমীর চাঁদ ইত্যাদি রূপক ও উপমা অর্থে অহরহ বাংলা সাহিত্য ও ভাষায় ব্যবহার করা হয়।

কবিতার বর্ণনা অনুযায়ী, নৌকার তরুণ-তরুণীরা উত্তাল আনন্দে ঢেউয়ের তালে তালে মিহি ও সুরেলা কণ্ঠে গাইছে জলের গান। এটা পড়তে পড়তে আমার লালন সাঁইজীর একটি গানের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে রূপক ও উপমা অর্থে মনে পড়ে গেল–'সাগরে জল নাই, বাজারে মারে ঢেউ, বাপের

যখন হয় নাই বিয়া ছেলের কোলে বউ গো, কলিতে পয়দা হয়েছে।' এই গানের মাধ্যমে লালন বলেছেন, 'সাগরে জল নাই' অর্থাৎ পরকালের জন্য আমাদের পুণ্য কর্ম নেই অথচ 'বাজারে মারে ঢেউ', অর্থাৎ আমরা কি না এই জগৎ বা বাজারে বাহারি রঙ্গ-ঢঙ্গ করার প্রতিযোগিতায় প্রতিনিয়ত লিপ্ত।

বিজ্ঞান সম্মতভাবে, মানব দেহ ও পৃথিবীর ৭০% জল। আমরাও কোনো না কোনোভাবে রূপক, উপমা ও প্রতীকী অর্থে জলের উপর কূল-কিনারাহীন ও দিকনিশানাবিহীন অবিরাম ভাসছি। এই দ্বন্দ্ব মুখর ও করোনা সংক্রমিত পৃথিবীতে আমাদের ঘাট বা গন্তব্য অজানা। বিশেষত তরুণ-তরুণীরা যে কোনো দেশ ও জাতির গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যার অংশ তারাও আজ বিনোদনে বিভোর ও দিকভ্রান্ত। এমনকি বাংলাদেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতীকী অর্থে আমাদের অবস্থাও কবিতার তরণীর মতোই টালমাটাল ও বেসামাল!

Bidhan Chowdhury

Lawrence Besra তোমার বিশ্লেষণ কবির মতোই চিকন পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রমাণ রেখেছে। রূপকাশ্রয়ী কবিতাটির যে অসাধারণ ব্যাখ্যা তুমি দিয়েছ তা আমার মতো পাঠকদের কবিতার মর্মার্থ উদঘাটন করতে উপকৃত হবে এবং কবিতাটির সার্থকতা অনুধাবন করতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৩

Like

• Reply

• 5d

Jibitesh Chandra Biswas

Lawrence Besra বন্ধু, আমার কবিতাটির যত অসম্পূর্ণতা বা অগোছালো কিছু রয়ে গিয়েছিল তোমার সুন্দর আর গোছালো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা পূর্ণতার আলো দেখল। এই প্রথম কেউ এই অধমের লেখা পড়ে এত সময় ব্যয় করল, আর সেটা আমার বন্ধুর কাছ থেকে আসাতে প্রাণ ভরে উঠল। তোমার শেষ অনুচ্ছেদটাই মাথায় ছিল, কবিতাটা লেখার সময়। বাকিটা সমালোচকের বদান্যতা।

কবিতার অসুখ হলে পাঠকের কী হবে?

কবিতার নাম : অসুখ
কবি : সাম্যসাথী ভৌমিক

চাঁদের রুপালি ফ্রেমে মন খারাপের আলো
বর্ষণ বুকে ধরে রেখে
সবকিছু ভুলে যাওয়া ভালো
আসলে আপন কেউ আছে? পর?
ফুটপাথে এক কাপ চা ছাড়া আর কেউ?
সিগারেট-জ্বলন্ত-হাত ছাড়া আর কেউ?
তবুও, সনদ দিতে হয়
আমাদের সবকিছু আছে
আমাদের সবকিছু ভালো
নিয়মিত হাজিরা দেই সমর প্রাঙ্গণ
যেতে হয় অন্ধকার বাড়ি
এই নৈমিত্তিক বিয়োগের ডাকনাম?
বেঁচে থাকা বলি
আমাদের রাজপথে সকল গাড়িই অ্যাম্বুলেন্স
সকল যাত্রীই রোগী
তুমি-আমি, আমরা সবাই অসুস্থ না হই
অসুখে তো ভুগি

(ফেসবুকের পাতায় প্রকাশ : ২৯ জুলাই ২০২১)

কবি মনের অন্দরমহলে সৃজনশীলতার কত যে অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডার রয়েছে

তার কথা এক অন্তর্যামী ছাড়া আর কেই বা বলতে পারে! আমার মতো একজন আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ মানুষ এই কবিতার উপর কিছু আলোকপাত করতে গিয়ে কবির রুপালি চাঁদের রোমান্টিক আলোকে আরও ম্লান, ধূসর ও বিবর্ণ করবে কি না তা নিয়েই আমার শঙ্কা ও ভয়!

বহুমাত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবির এই 'অসুখ' কবিতাটি কৃষ্ণপক্ষের সপ্তদশী রুপালি চাঁদের আলোর মতো ১৭টি লাইন সংবলিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। কবিতাটির প্রতিটি শব্দ ও বাক্য অত্যন্ত সহজ-সরল, সাবলীল এবং প্রাঞ্জল যেন সর্বস্তরের মানুষের নিত্যদিনের কথোপকথন। শৈল্পিক সরলতার মোড়কে কবিতাটি আবৃত হলেও এর ব্যাপকতা ও গভীরতা অনেক বেশি। যেমন গভীর নদী খরস্রোতা খুব কমই হয়।

করোনা মহামারির এই দুঃসময়ে মানুষের একান্ত আপন জনের সাথে সম্পর্কের নির্লিপ্ততা, নির্জীব একাকিত্ব ও নিদারুণ অসহায়ত্ব নিয়ে কবি মনে অসংখ্য প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটেছে। সেই সাথে প্রত্যেক পাঠককে বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে নিজেকে জানার এবং আত্মোপলব্ধি করার প্রয়াস জাগিয়েছে। কেননা আক্ষরিক অর্থে আমরা সবাই অসুস্থ না হলেও ভাবগত, তত্ত্বগত কিংবা রূপক, উপমা ও প্রতীকী অর্থে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন নেতিবাচক উপসর্গের দ্বারা বিভিন্ন মাত্রার অসুখের শিকার!

কবিতার প্রথম লাইন 'চাঁদের রুপালি ফ্রেমে মন খারাপের আলো'–এ রকম আলো-অন্ধকার এবং ছায়া-প্রতিচ্ছায়ার অচলয়াতনের মাঝেই জীবনের হতাশা ও অবসাদ বোধ ধোঁয়াশার মতো লুকিয়ে থাকে। তাই এই কবিতাটি পড়তে পড়তে আমার বারবার রূপসী বাংলার কিংবদন্তি আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের 'বোধ' কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ছে। যেমন–'স্বপ্ন নয়–শান্তি নয়–ভালোবাসা নয়, হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়' কিংবা–'চোখে কালো শিরার অসুখ।'

কবির প্রতিটি কবিতাই কোনো না কোনোভাবে সমসাময়িক যুগের প্রতিচ্ছবি। ক্ষণিকের এই জগতে রিটার্ন টিকিট হাতে নিয়ে আসা প্রাণিকুলে উর্বর মস্তিষ্ক সম্পন্ন মানুষ আমরা সত্যিকার অর্থে কে আপন আর কে পর এই গোলক ধাঁধার ভাবনায় নির্জীব একাকিত্ব ও অসহায়ত্ব নিয়েও সমর প্রাঙ্গণে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে গরহাজিরা দিয়ে থাকি। এ নিয়ে কবি

মনে অসংখ্যবার অর্থাৎ পাঁচবার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়েছে। চলমান করোনা ছোঁয়াচে ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী তাণ্ডবে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের আপনজনদের নাম বিয়োগের খাতায় অনিচ্ছায় লিখতে বাধ্য হচ্ছি। এই পাঁচটি জিজ্ঞাসা কি আমাদের মানবদেহের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুরক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন নয়? যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে না চলার প্রবণতা ও জৈব সুরক্ষা বলয় তৈরিতে আমাদের অনাদর-অবহেলার কারণে আমরা কি এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধমে করোনায় সংক্রমিত হয়ে অন্ধকার বাড়ির অনাহূত অতিথির তালিকা দীর্ঘায়িত করছি না? আমাদের নিথর ও স্থবির সামাজিক জীবনের পাশাপাশি, আজ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গেও দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত নামক ভয়াবহ জীবাণুর সংক্রমণ ঘটেছে। মিথ্যাবাদী রাখালের মতো আত্মঘাতী ও আত্মপ্রবঞ্চনামূলকভাবে এখনও আমরা বড়াই করে বলি, 'আমাদের সবকিছু আছে, আমাদের সবকিছু ভালো।'

কবিতার শেষের চারটি লাইন 'আমাদের রাজপথে সকল গাড়িই অ্যাম্বুলেন্স, সকল যাত্রীই রোগী, তুমি-আমি, আমরা সবাই অসুস্থ না হই, অসুখে তো ভুগি' অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সময় উপযোগী বার্তা বহন করে। শুধু এই করোনাকালীন ঊর্ধ্বমুখী মানুষের মৃত্যুর মিছিলের সময়েই নয় বরং এর আবেদন চিরন্তন। আমার কাছে 'গাড়ি' শব্দটির দ্বৈত অর্থ বা দ্যোতনার একটা আবহ রয়েছে। এখানে দুই ধরনের গাড়ির কথা উহ্যভাবে ইঙ্গিত দেয়া আছে–একটি হলো যান্ত্রিক গাড়ি আর অন্যটি মানব গাড়ি। অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গানে কবি, মরমি বাউল ও দেহ তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক সাধকেরা আমাদের এই মানব দেহকে কখনো ঘড়ি আবার কখনো গাড়ির সাথে ভাবগত, দেহ-তত্ত্বগত কিংবা রূপক, উপমা ও প্রতীকী অর্থে তুলনা করে আসছেন।

যেমন–আবদুর রহমান বয়াতির গানে বলা আছে 'মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করি... একখান চাবি মাইরা, দিছে ছাইড়া, জনম ভইরা চলতে আছে।' বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের প্রয়াত মরমি বাউল কবি ও শিল্পী শাহ্ আব্দুল করিম কথায় ও সুরে বলে গেছেন, 'গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না, মহাজনে যতন করে, তেল দিয়াছে টাংকি ভরে, গাড়ি চালায় মন ড্রাইভারে, ভালো-মন্দ বোঝে না।' আবারও ওপার বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী পবন দাস বাউলের গানের মাধমে মানব গাড়ির বর্ণনা সত্যিই আসাধারণ। 'ইঞ্জিনেরই আগুনের কল, গাড়ির কত বল, গাড়ি থেকে বেরুলো নারী,

দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি, দুই গাড়িতে ধাক্কা লেগে, কত মানুষ গেল রসাতল, এ গাড়ির সাহেব ৬ জনা, ময়লা টানা এরাই ২ জনা।'

এই কবিতা আলোচনা করতে গিয়ে আগে যে পঞ্চেন্দ্রিয়ের কথা বলেছি–এদের নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের উর্বর মস্তিষ্ক, হৃদয় ও মন। মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শ ছাড়া যেমন কোনো যান্ত্রিক গাড়ি চলতে পারে না, তেমনি মানব দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও মনের সুষম সমন্বয় ছাড়া আমাদের এই মানব গাড়িও সঠিক পথে চলতে পারে না। আমাদের মানবিক গুণাবলি, সুকুমার প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণের যখন ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটে না তখনই যাবতীয় নেতিবাচক প্রলোভন ও প্রবৃত্তি আমাদের মানব দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গে ঘুণে ধরে। ফলে আমরা অসুস্থ হই ও নানাবিধ অসুখে ভুগি। এই মানব গাড়ি হয়ে যায় অচল ও বিকল। যেমনটি বাংলাদেশের রাজপথে লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা ত্রুটিযুক্ত গাড়ি ও নিয়ম-নীতিহীন বেপরোয়া গাড়ির চালকের কারণে প্রতিদিন 'মৃত্যুর সনদ'-এর জন্য লাশের সারি দীর্ঘায়িত হচ্ছে। অথচ সেই সব যান্ত্রিক গাড়ির রয়েছে চকচকে ফিটনেস 'সনদ;। একইভাবে দেশের উচ্চ মানের 'সনদ'ধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড যাত্রাপালার কৌতুককেও হার মানিয়েছে। পরিশেষে আমাদের মানবিক ও সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোকে যান্ত্রিক গাড়ি দিয়ে ধামাচাপা দিয়ে হত্যা করে মানুষরূপী এই মানব গাড়ির ঝকঝকে-তকতকে সনদ তো আর চাই না!

-লরেন্স বেসরা

ম্যানচেস্টার, কানেকটিকাট, আমেরিকা

০৭.৩১.২০২১

Hushain Shakir

প্রথমত কবিতার কবিকে সাধুবাদ দেই। অসাধারণ লেখনী।

কবিতার অসুখে বিদ্বত আলোচক যেভাবে আলোকপাত করলেন, তা অবিস্মরণীয়। কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যাও হয়তো আলোকিত হয়ে গেল আলোকপাতের আলোর ঝলকানিতে। এমন লেখা চলতে থাকুক লরেন্স দা।

Bidhan Chowdhury

বিশ্লেষণ প্রত্যাশার মাত্রাকে অতিক্রম করেছে। কবিতাটি অবশ্যই বর্তমান বাস্তবতায় পাঠকমাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সত্যি বলতে কবি সাম্যসাথীর লেখনীতে আধুনিক জীবনের টানাপড়েন, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। তবে বর্তমান কবিতার ব্যাখ্যায় তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ। এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে কবিতাটির মহিমা পাঠকের কাছে বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে। অভিনন্দন, বন্ধু।

Nilmoni Aich

রতনে যেমন রতন চেনে, ড. তেমন ড.-কে চেনে। সেয়ানে সেয়ানে না হলে কি আর ঠিকমতো জমে ওঠে? এতদিনে আসল সমালোচকের দেখা মিলল। চলুক তবে...

আমরাও একটু রস আস্বাদন করতে থাকি।

Borendra Lal Tripura

গভীর, তাত্ত্বিক, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিকতায় ভরা অসাধারণ বিশ্লেষণ সত্যিই বিমুগ্ধ করেছে আমাদের। সাধারণ পাঠকদের কবিতা যদি টেনে নিয়ে যায় তটরেখার কাছে, তোমার বিশ্লেষণ অবগাহন করিয়েছে একেবারে অতলান্তের গভীরে।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের অদৃশ্যমান শত্রুকে বধ করব কীভাবে?

কবিতার নাম : বেওয়ারিশ

কবি : সাম্যসাথী ভৌমিক

আজকের হেডলাইন
ডাস্টবিন থেকে বেওয়ারিশ হৃৎপিণ্ড উদ্ধার
ময়নাতদন্ত শেষ
রিপোর্ট বলছে, ওটা মানুষেরই ছিল
আমাকেই ধরে নিয়ে যায়
আমার কী দোষ?
জেরা করে, বসে কোর্ট
নিজের হৃদয়কেও ছুড়ে ফেলে দেয়?
হাজারো প্রশ্নবাণ, আপনি মানুষ?
তাই তো! হৃদয়বিহীন লোক চোখে দেখা যায়?
হুজুর, আপনিও নিশ্চিত ওটা শুধুই আমার? আর কারো নয়?
আমিও বাঁচতে চাই
মানুষের মতো করে প্রতিদিন হৃৎপিণ্ড ফেলে রেখে যাই

(ফেসবুকের পাতায় প্রকাশ : ৫ আগস্ট, ২০২১)

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে'–'আদর্শ ছেলে' শিরোনামে এই কবিতাটি লিখেছিলেন কবি কুসুমকুমারী

দাশ। কিন্তু নিয়তির কী পরিহাস! তাঁর সুযোগ্য পুত্র রূপসী বাংলার আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশ প্রথমত কথায় অর্থাৎ কবিতামালার জন্য বড় বা বিখ্যাত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর অভূতপূর্ব কালজয়ী কবিতার জন্য কথা ও কাজে দুটোতেই বড় হয়েছিলেন। সেই জন্যই হয়তো আপ্তবাক্যের মতো বলা হয়ে থাকে যে, কবিরা মিথ্যার বেসাতি করে, মিথ্যা স্বপ্নের জাল বোনে, মানুষের অনুভূতিগুলোর সাথে লীলাখেলা করে, বাহারি শব্দ ও কথামালার মন্ত্রমুগ্ধকর ছন্দ এবং চমৎকার সব রূপক, উপমা ও প্রতীকের জাদুকরী ব্যবহার ও কাব্যিক উপস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের মনকে কল্পনার রঙিন ফানুসের ঐন্দ্রজালিক মায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখে। এই রকম হাজারো অভিযোগের ভিড়ে বন্ধুপ্রতিম কবি 'সাম্যসাথী ভৌমিক'-এর 'বেওয়ারিশ' কবিতাটি যেন অন্ধের দেশে আয়না বিক্রি করার মতো মর্মান্তিক হলেও নিজ স্বকীয়তা ও অনবদ্য সৌন্দর্যে বিকশিত। চলমান নিকষ কালো ও রূঢ় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতাটির শিরোনাম অনেকের অপ্রিয় হলেও সত্য বচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ কবি আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের নিরাকার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন।

মানুষের জন্ম ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যের মূর্ত প্রতীক আমাদের এই স্বয়ংক্রিয় হৃৎপিণ্ড, যা আমাদের দেহে অবিরত অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকণা উদারভাবে সরবরাহ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সইডসহ অন্যান্য ক্ষতিকারক বর্জ্য শোধন ও অপসারণের মাধ্যমে আমাদের এই মানব শরীরকে সচল, সতেজ ও সজীব রাখে। মানব দেহের বৃদ্ধি, বল, গতি ও পরাগায়নের চালিকাশক্তি আমাদের এই হৃৎপিণ্ড সত্যিকার অর্থেই মানুষসহ সকল জীবের প্রাণ ভোমরা যেন নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের প্রাণের সঞ্চারী ও সক্রিয় অস্তিত্বের একমাত্র স্বাক্ষর।

আলোচ্য এই কবিতাটিকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। কবিতাটি নিজেই স্ব-বিশ্লেষণধর্মী। অত্যন্ত সহজ সরল ও বোধগম্য ভাষায় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, জীবনাচরণ, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সর্বোপরি মানুষের মনুষ্যত্ববোধের উপর একটি জটিল রসায়নের সমীকরণ দাঁড় করানো হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, কবিতাটি শুরু হয়েছে ঠিক মাঝ পথে অর্থাৎ কোনো এক শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যার ঠাঁই হয়েছে ময়লা আবর্জনার ভাঁড়ারে। চিকিৎসা শাস্ত্র মতে, গর্ভধারণের প্রায় ২১ দিন পরে একটি মানব ভ্রূণীয় হৃৎপিণ্ড স্পন্দন শুরু করে। কেন ও কী কারণে একটি নবজাতককে বা একটি অপরিপক্ব মানব শিশুকে অমানবিকভাবে ফেলে দেয়া

হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তবে কবিতার মূলসুরের সূত্র ধরে এবং কবিতার শেষ লাইন 'মানুষের মতো করে প্রতিদিন হৃৎপিণ্ড ফেলে রেখে যাই' পড়ে সহজেই অনুমেয় যে, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে আমরা নীরবে নিভৃতে কত অযুত-নিযুত কোটি ভ্রূণ হত্যা করি যা কি না সীমিত পরিসরে গোপন ও অবৈধ শরীরসর্বস্ব ভালোবাসার ফল কিংবা আমরা নিজেদের রূপ, সৌন্দর্য, চাকরি ও ঠুনকো সামাজিকতার আড়ালে কতটা স্বাচ্ছন্দে বড়াই ও অহমিকা করে বলি 'মিস ক্যারেজ' হয়েছে। এ রকম কত অজানা ঘরেই যে স্টার জলসার মতো যৌন বিকারগ্রস্ততার রঙ্গমঞ্চ রয়েছে তা এখনও সংবাদপত্রের হেডলাইন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে!

কবিতার হৃদয় বিদারক হেডলাইন 'ডাস্টবিন থেকে বেওয়ারিশ হৃৎপিণ্ড উদ্ধার'কে ছাপিয়ে যায় সম্প্রতি সাহেব বিবির বাঙেজিন, পরী, দৈত্য, দানবের লাইভ শো। চণ্ডীদাসের 'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' যেন নাম পরিচয়হীন বেওয়ারিশ রূপকথার গল্প। কবিতার আর একটি মর্মস্পর্শী লাইন, 'হুজুর, আপনিও নিশ্চিত ওটা শুধুই আমার? আর কারো নয়? আমিও বাঁচতে চাই'–বিবেকের বিচারকের কাছে একটি সদ্য ভূমিষ্ঠজাত নবজাতক শিশুর করুণ আর্তনাদ জলীয় বাষ্পের ন্যায় অসীমে নিঃশেষ হয়। কবি সুকান্তর মতো আমাদের কাছে নেই কোনো প্রতিজ্ঞা। এই পৃথিবীর জাল জঞ্জাল সরিয়ে অনাগত শিশুর জন্য নিরাপদ ও বসবাসযোগ্য পরিবেশ গড়ে তোলার নেই কোনো কর্মযজ্ঞ। কেননা ইতিমধ্যে শিশু পাঠ্য পুস্তক রচয়িতাদের অতিমাত্রায় সংবেদনশীলতা ও সৃজনশীলতার কারণে ছাগলকে গাছে উঠিয়ে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন সরবরাহকারী গাছের সব পাতাকে সাবাড় করে দিয়েছি। অর্ধশতাব্দী আগে কবি সুফিয়া কামালের 'আজিকার শিশু' কবিতার যে অঙ্গীকার "শস্য-শ্যামলা এই মাটি মা'র অঙ্গ পুষ্ট করে, আনিবে অটুট স্বাস্থ্য, সবল দেহ-মন ঘরে ঘরে" তা আমাদের 'দেহের যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ'-এর সাথে প্রতিনিয়ত প্রতারণা করে।

আরও যদি অন্যভাবে দেখি, আজ সব সম্ভবের দেশ ও সব ধরনের অঘটন ঘটনের দেশ বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিকে গাণিতিক ও জ্যামিতিকসহ বহুমাত্রায় হার মানিয়েছে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি মাছসহ সব কিছুতেই ফরমালিনে সয়লাব, গৃহপালিত পশুপাখিতে উচ্চমাত্রায় ক্ষতিকর থাইরয়েড, স্টেরয়েড ও বিভিন্ন ধরনের জাদুকরী মোটা তাজাকরণ হরমোনের অযাচিত প্রয়োগ। করোনার সংক্রমণে কর্মহীন

নিরন্ন লোকজন মুড়ি খাওয়ার জন্য সামান্য লবণ কিনতে না পারায় তাদের চোখের নোনা জলই একমাত্র ভরসা! খাতা-কলমে লাফিয়ে লাফিয়ে জিডিপি, বার্ষিক মাথাপিছু আয় এবং মানুষের গড় আয়ু বাড়লেও উন্নয়নের মহাসড়কে অস্বস্তিকর যানজটের মতো আজ আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা লোপ পেয়েছে। দৃশ্যমান শত্রুকে ইচ্ছে করলেই বধ করা যায়, প্রকৃতির অক্সিজেনের অফুরন্ত ভাণ্ডার সবুজ অরণ্য ধ্বংস করা যায়, ভূমিদস্যু, বনখেকো ও নদীখেকোদের দ্বারা শ্যামল ধরিত্রীকে বিরানভূমিতে পরিণত করা যায়, পতিত জমি ও বেওয়ারিশ সম্পত্তি রাতের আঁধারে জবর দখল করা যায়, সংখ্যালঘু জনগণকে প্রাণনাশের হুমকি-ধমকি দিয়ে ভিটে ছাড়া ও দেশ ছাড়া করা যায়, কিন্তু যে মূল্যবোধহীন নীতি, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও মানবিকতা বিবর্জিত মনুষ্যত্ব নামক ঘাতক জীবাণু আমাদের হৃৎপিণ্ডের সমস্ত অলিন্দ, নিলয় এবং আট কুঠরি ও নয় দরজার প্রতিটি শিরা উপশিরা ও অস্থি-মজ্জায় বাসা বেঁধেছে সেই অদৃশ্যমান শত্রুকে বধ করব কীভাবে?

যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের জীবন-কাহিনির মিল ও অমিল

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস হাজার হাজার বছরের। যীশু খ্রিষ্টের জন্মের বছর থেকেই আধুনিক ইংরেজি বর্ষ বা খ্রিষ্টাব্দ গণনার শুরু। আজ থেকে ২০২১ বছর আগে যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল সেই সময়কার প্যালেসটাইন এবং আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্রের বেথেলহেম নামক এক জরাজীর্ণ গোশালায়। কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন হিন্দু ধর্মানুসারীদের আরাধ্য ভগবান। শাস্ত্রীয় বিবরণ ও জ্যোতিষ গণনার ভিত্তিতে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরার রাজা কংসের শাসন আমলে একটি কারাগারে পিতা বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম গর্ভে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২৮ সালে (অনেকের মতে প্রায় ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)।

যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, শৈশব, বেড়ে ওঠা, বিশাল কর্মযজ্ঞ ও জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কিত অনেক মিল ও অমিল রয়েছে। তার কিছু অংশ সংক্ষেপে এখানে আলাচনা করা হলো :

১। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়ের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে। খ্রিষ্টান ধর্ম মতে যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারিয়ার গর্ভে। অন্যদিকে ভাগবত পুরাণ অনুযায়ী, কোনো প্রকার যৌনসংগম ব্যতিরেকেই কেবল 'মানসিক যোগের' ফলে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল কারারুদ্ধ অবস্থায় দেবকীর অষ্টম গর্ভে (অনেকের মতে প্রথমত চতুর্ভুজা পরে দ্বি-ভুজায় রূপ নেয়)।

২। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই ছিল রাজকীয় পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ও রাজকীয় পরিবারের সন্তান।

৩। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই জন্মের পরে অত্যাচারী রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যেতে হয়েছিল। মথুরার রাজা কংস একটি দৈববাণীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের

হাতে তার মৃত্যু হবে। এই কথা শুনে তিনি দেবকী ও বাসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রথম ছয় পুত্রকে হত্যা করেন। দেবকী তার সপ্তম গর্ভ রোহিণীকে প্রদান করলে, বলরামের জন্ম হয়। এরপরই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের জীবন বিপন্ন জেনে জন্মরাত্রেই দৈবসহায়তায় কারাগার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাসুদেব তাকে গোকুলে তার পালক মাতা-পিতা যশোদা ও নন্দের কাছে রেখে আসেন। একইভাবে যীশু খ্রিষ্টের জন্মের পরে হেরদ রাজা যখন জানতে পারলেন যে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই তিনি বেথেলহেমসহ পুরা এলাকার সব নবজাতক শিশুপুত্রকে মেরে ফেলার হুকুম দিলেন। তাই মৃত্যু এড়াতে জোসেফ ও মারিয়া শিশু যীশুকে নিয়ে রাতের আঁধারে একটি গাধার উপর চড়ে মিশর দেশের মুতুরিয়া প্রদেশে পলায়ন করেন।

৪। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই জন্ম হয়েছিল এক অরাজকতার সময় এবং যাদের এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল এই জগতের মানুষের পাপ হরণ করে মানুষের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভালোবাসা, প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও মানব ধর্ম স্থাপন করা।

৫। যীশু খ্রিষ্টকে বাইবেলে একজন উত্তম মেষপালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণকে একজন রাখাল বালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ে উভয়েরই মিল রয়েছে এবং তা হলো উভয়েই একজন কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন।

৭। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই মৃত্যু হয়েছিল ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। যীশু খ্রিষ্টকে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করে ক্রুশ কাষ্ঠে নির্দয়ভাবে ঝুলিয়ে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে একদিন শ্রীকৃষ্ণ গাছে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জ্যারা নামের একজন শিকারি কৃষ্ণের ঝুলন্ত ডান পায়ের গোড়ালিকে একটি হরিণের কান ভেবে তীর নিক্ষেপ করেন। এই তীরের আঘাতেই পরবর্তী কালে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু বরণ করেন।

৮। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই মৃত্যুর আগে তাদের হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন। ক্রুশের উপরে মৃত্যুর আগে যীশু খ্রিষ্ট তার অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে বলেছেন, 'হে প্রভু এদের ক্ষমা করো। কারণ

এরা কী করিতেছে তা নিজেরাই জানে না।' একেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জ্যারা নামের সেই শিকারিকে ক্ষমা করে দেন এবং যীশু খ্রিষ্ট যেভাবে তার ডান পাশে ক্রুশবিদ্ধ চোরকে বলেছেন যে তুমি আজকেই আমার সাথে স্বর্গবাসী হবে ঠিক সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণ জ্যারা নামের সেই শিকারিকে বলেছেন যে সে স্বর্গবাসী হবে।

৯। ধর্মবিশারদদের মতে, যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই নামকরণের বিষয়ে অনেক মিল পরিলক্ষিত হয়। খ্রিষ্টান ধর্ম মতে, যীশু খ্রিষ্টের অনেক নাম বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে যেমন–খ্রিষ্ট, ক্রাইস্ট, খ্রিস্তস, ক্রিস ইত্যাদি। তেমনিভাবে শ্রীকৃষ্ণকেও অনেক নামে ডাকা হয়। যেমন–শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কেষ্ট, ভগবান, বিষ্ণু।

১০। সর্বোপরি যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই যে বিষয়ে মিল রয়েছে তা হলো, দুই জনই মানবরুপী এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতিমূর্তি। দুই জনেই মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছেন এবং অনেক মানুষের সামনে স্বর্গে আরোহণ করেছেন। খ্রিষ্টান ধর্ম মতে, যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র। পিতা ঈশ্বর, পুত্র যীশু ও পবিত্র আত্মা মিলিয়ে তিন ব্যক্তিতে এক পরমেশ্বর (ঐড়ষু ঞৎরহরঃু)। অনুরূপভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অষ্টম অবতার অর্থাৎ অদৃশ্য ভগবানের মানব সদৃশ হলো শ্রীকৃষ্ণ। অনেকের মতে, যেই বিষ্ণু সেই কৃষ্ণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব মিলিয়ে হয় এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বর।

ত্রিরত্নের ত্রিমূর্তি : শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশু

অবিনশ্বর ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই পৃথিবীর নশ্বর মানুষ। প্রকৃতির অমোঘ নিয়তি বলেই রিটার্ন (ফিরতি) টিকিট হাতে নিয়েই মানুষের এই পৃথিবীর রঙ্গ মঞ্চে কতই না রঙ তামাশা। অবশেষে এই রঙ মহল থেকেই মানুষের একদিন নিরুদ্দেশে অন্তিম যাত্রা অবধারিতভাবেই সম্পন্ন হয়। ধর্মের আবরণে স্বর্গ ও নরকের যে কল্পচিত্র মানুষের কাছে পরিবেশন করা হয়েছে তা মূলত বিশ্বাসের ব্যাপার। কারণ সাধারণ কোনো মানুষের স্বর্গের সর্বসুখ কিংবা নরকের জ্বলন্ত পরিবেশের কদর্যতা দেখে এই মর্তে ফিরে আসার সৌভাগ্য হয়নি। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানব; ত্রিরত্ন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং যীশুও সাধারণ মানুষের মতো এই ধরাধাম ত্যাগ করেন। তাঁরা একাধারে ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার ও মহাসাধক হয়েও আমাদের মতো রক্ত মাংসের মানুষের মতোই রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ও নির্দয় নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং যীশু ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করলেও তাদের অন্তিম যাত্রার মধ্যে বেশ কিছু মিল ও অমিল লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বইপত্রের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং যীশুর প্রচারিত ধর্মের মঙ্গল বাণী প্রচার ও অন্তিম যাত্রার যে সাদৃশ্য রয়েছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

যীশু খ্রিষ্টের জন্মের বছর থেকেই আধুনিক ইংরেজি বর্ষ বা খ্রিষ্টাব্দ গণনার শুরু। আজ থেকে ২০২২ বছর আগে যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়েছিল সেই সময়কার প্যালেসটাইন এবং আজকের ইসরায়েল রাষ্ট্রের বেথেলহেম নামক এক জরাজীর্ণ গোশালায়। কৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ হলেন হিন্দু ধর্মানুসারীদের আরাধ্য ভগবান। শাস্ত্রীয় বিবরণ ও জ্যোতিষ গণনার ভিত্তিতে লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল মথুরার (বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশ) রাজা কংসের শাসন আমলে একটি কারাগারে পিতা বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম গর্ভে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২৮ সালে (অনেকের মতে প্রায় ৪০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে)। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম সিদ্ধার্থ বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ সালে নেপালের লুম্বিনির এক রাজকীয় পরিবারে। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, যীশু খ্রিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ তাঁরা প্রত্যেকেই

ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্যপ্রাচের রাজকীয় পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ও রাজকীয় পরিবারের সন্তান। যীশু খ্রিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ–এদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এক অরাজকতার সময় এবং যাদের এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল এই জগতের মানুষের পাপ হরণ করে মানুষের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা, ভালোবাসা, প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও মানব ধর্ম স্থাপন করা।

শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়েছিল একজন শিকারির ছোড়া তীর বিদ্ধ হয়ে, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১২৫ বছর। খ্রিষ্টপূর্ব ৩১৩৮ সালে ধর্মের জয় ও অধর্মের বিনাশ নামক ১৮ দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাদব-পাণ্ডব বংশ জয়লাভ করে। কথিত আছে যে, অর্জুনের নেতৃত্বে শ্রীকৃষ্ণ অনেক ছলনা, শঠতা, মিথ্যাচার ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন। পরাজিত কৌরব বংশের রাজমাতা গান্ধারী তার শতাধিক পুত্রকে যুদ্ধে হারিয়ে শোকে-দুঃখে প্রায় পাগলিনী হয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধারী কৃষ্ণকে সরাসরি দায়ী করেন তার শত পুত্রের মৃত্যুর জন্য। তিনি কৃষ্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'তুমি কোনো জঙ্গলে একলা আসক্ত এক বৃদ্ধ পশুর ন্যায় এক শিকারির হস্তে তীর বিদ্ধ হবে।' যাদব বংশের ধ্বংসের পরে একদিন শ্রীকৃষ্ণ একটি গভীর জঙ্গলে একটি গাছের নিচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জ্যারা নামের একজন শিকারি কৃষ্ণের ঝুলন্ত ডান পায়ের গোড়ালিকে একটি হরিণের কান ভেবে তীর নিক্ষেপ করেন। এই তীরের আঘাতেই পরবর্তী কালে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পিতা বাসুদেবের মৃত্যু হয়। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর সেই খবর শ্রীকৃষ্ণকে দিতে কয়েকজন সঙ্গী-সাথিসহ তপোবনে যান। সেখানে কয়েক দিন খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ খুঁজে পান এবং সেখানেই অর্জুন তাঁর সঙ্গী-সাথিসহ কয়েকজন মিলে শ্রীকৃষ্ণের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

বুদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল মাংস খেয়ে। যদিও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। কথিত আছে, বুদ্ধ ২৯ বছর বয়সে এক জোছনা রাতে সংসার ধর্ম ও শিশুপুত্র রাহুলকে ত্যাগ করে অরণ্যচারী হন এবং ৩৫ বছর বয়সে ধ্যান ও তপস্যা করে সিদ্ধ (বোধ/বোধি/জ্ঞান) লাভ করেন। এই পার্থিব মোহ মায়া এবং আসক্তি থেকে মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখার জন্য তিনি কঠিন ধ্যান, তপস্যা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীর পথ বেছে নিয়েছিলেন। অহিংসা, শান্তি ও সকল জীবের প্রতি মহানুভবতা ছিল তাঁর মানব মুক্তির অমূল্য বাণী। বিভিন্ন বই পত্র থেকে যতটুকু জানা যায় যে, একদিন বুদ্ধ তাঁর এক ভক্তের

পীড়াপীড়িতে কুণ্ডা নামক একজন কর্মকারের বাড়িতে অতিথি হয়ে শূকরের মাংস দিয়ে ভোজন করেন। অনেক জায়গায় অবশ্য উল্লেখ আছে যে সেদিন বুদ্ধ তাঁর ৮০তম জন্মদিন পালন করছিলেন। রাজপরিবার ছেড়ে ৫০ বছর তিনি নিরামিষভোজী ছিলেন। সেই সময় তিনি ছিলেন ৮০ বছরের বয়স্ক ও পরিণত মানুষ এবং অনেক বছর পর হঠাৎ করে মাংস খাওয়ার পর তাঁর শরীরের মধ্যে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও বিষক্রিয়া হয়। অনেকের মতে, শূকরের মাংস রান্না করা হয়েছিল ব্যাঙের ছাতা/ছত্রাক ও বাঁশের কুরল দিয়ে, যা তাঁর পরিপাকতন্ত্রে ব্যাপক মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর গাত্র বর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। কুশীনগরে তিনি তাঁর অন্তিম অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁর প্রিয় সহচর আনন্দকে দুটি বোধি গাছের নিচে একটি কুশন ও বিছানা তৈরি করতে বলেন। বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় যে বাণী ও শেষ উপদেশ দিয়ে গেছেন তাঁর সম্মিলিত রূপই হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূল স্তম্ভ।

যীশু তাঁর শিষ্যদের নিয়ে যে নৈশভোজ করেছিলেন সেখানেই তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ১২ জন শিষ্যের মধ্য থেকে একজন তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিবে। আর ঠিক তাই হলো, জুডাস মাত্র ৩০টি রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেন। সেদিন রাত্রে যীশু গেথসেমানি নামক এক জলপাই বাগানে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রার্থনারত ছিলেন। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যীশু খ্রিষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ ও গৌতম বুদ্ধ তাঁরা প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় ছায়াঘেরা নিকুঞ্জবন ও তপোবনে ছিলেন। যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণের উভয়েরই মৃত্যু হয়েছিল ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। যীশু খ্রিষ্টকে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করে ক্রুশ কাষ্ঠে নির্দয়ভাবে ঝুলিয়ে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে একদিন শ্রীকৃষ্ণ গাছে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। জ্যারা নামের একজন শিকারি কৃষ্ণের ঝুলন্ত ডান পায়ের গোড়ালিকে একটি হরিণের কান ভেবে তীর নিক্ষেপ করেন। এই তীরের আঘাতেই পরবর্তী কালে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধ, যীশু খ্রিষ্ট ও শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকেই মৃত্যুর আগে তাঁদের খাবার প্রদানকারী ও হত্যাকারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে গেছেন। ক্রুশের উপরে মৃত্যুর আগে যীশু খ্রিষ্ট তার অত্যাচারীদেরকে ক্ষমা করে বলেছেন, 'হে প্রভু এদের ক্ষমা করো। কারণ এরা কী করিতেছে তা নিজেরাই জানে না।' একেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জ্যারা নামের সেই শিকারিকে ক্ষমা করে দেন এবং যীশু খ্রিষ্ট যেভাবে তার ডান পাশে ক্রুশবিদ্ধ চোরকে বলেছেন যে তুমি আজকেই আমার সাথে স্বর্গবাসী হবে ঠিক সেভাবেই শ্রীকৃষ্ণ জ্যারা নামের সেই শিকারিকে বলেছেন যে সে

স্বর্গবাসী হবে। অনুরূপভাবে বুদ্ধ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর আনন্দ ও অন্যান্য সাধু, সন্ন্যাসী ও শিষ্যকে তাঁর শেষ ভোজনের খাবার প্রদানকারী কুণ্ডা কর্মকারকে ক্ষমা করে দিতে বলেছেন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশুর জীবন কাহিনি একে অপরের থেকে ভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে স্পষ্ট তা হলো আদর্শিক ও ঐশ্বরিক ভাব ধারা। শ্রীকৃষ্ণের মানব জীবন শুরুই তো হয়েছে যুদ্ধ দিয়ে। কিন্তু সেই যুগের যুদ্ধের ধারণা যতটা না ভূ-রাজনৈতিক, তার থেকে বেশি দৈব-রাজনৈতিক। তিনি যতটা না অনিশ্চিত মানব জীবনের প্রতিনিধি, তার থেকে অনেক বেশি আধ্যাত্মিক। আর পৃথিবীর ইতিহাসের (কতটা বাস্তব নাকি শুধুই মহাকাব্যিক জানি না) অন্যতম বিরাট যুদ্ধে (কুরুক্ষেত্রে) তিনি উপস্থিত ছিলেন। এক পক্ষকে সৈন্য দিয়েছেন, অন্য পক্ষের রথের সারথি হয়েছেন। নিজে অস্ত্র না ধরলেও এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনিই অনুমোদন করেছেন। সর্বোপরি তিনি যুদ্ধের ময়দানেই তাঁর সব থেকে গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মোচন করেছেন। সেখানেও তিনি যতটা মানবিক চরিত্র, তার থেকে বেশি ঐশ্বরিক।

অন্যদিকে গৌতম বুদ্ধের দর্শন অবশ্যই অত্যন্ত উঁচু মানের এবং সে কারণে তিনি পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষের আদর্শ। তিনি ছিলেন রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী। তাই এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ অবান্তর। গৌতম বুদ্ধ ৮০ বছর বয়সে তৎকালীন মল্ল রাজ্যের রাজধানী কুশিনগরে প্রাণ ত্যাগ করেন, সেই ঘটনাটিকে বুদ্ধিষ্টরা 'মহাপরিনির্বাণ' নামে অভিহিত করে থাকেন। গৌতম বুদ্ধ শান্তি, মানবতা ও সকল আত্মার মুক্তির পথ দেখিয়েছেন বিধায় অনেক রাজা ও মহারাজা যেমন সম্রাট অশোক গৌতম বুদ্ধের দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ও বিকাশ লাভের জন্য অসামান্য অবদান রাখেন।

যীশু খ্রিষ্টের যে প্রতিষ্ঠিত রূপ আমরা জানি, সেটা মূলত রোমানদের হাতে গড়া। যীশুর মৃত্যুর প্রায় ৩০০ বছর পর রোমান সম্রাট কন্সটাটিন ৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাত দিয়েই ইউরোপে খ্রিষ্ট ধর্ম প্রসার লাভ করে। যীশুর জীবন মাত্র ৩৩ বছরের। তাঁর আদর্শের মূল জায়গাটাই হলো যে তিনি কোনো অস্ত্র ধরেননি কিংবা কোনো যুদ্ধ করেননি। কেউ আঘাত করলেও উলটো তিনি অন্য গাল পেতে দিয়েছেন এবং অপরাধী ও শত্রুদের ক্ষমা করেছেন। পরিশেষে মানব সম্প্রদায়ের সমস্ত পাপের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। যীশু তাঁর জীবনের সমস্ত আদর্শ নিয়েই তিনি একজন মহামানব, ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা ঈশ্বর।

গল্প হলেও সত্যি

বেশ কয়েক দিন আগে নিজের গায়ে নিজেই কয়েকবার চিমটি কাটলাম পত্রিকার খবরটা পড়ে। কয়েক বছর ধরে আলোচনায় শীর্ষে থাকা বিখ্যাত এক ধনকুবেরের যত কীর্তি-কাহিনি সবই গল্প। সব অসম্ভব আর অঘটনের দেশ বাংলাদেশে কোনটা গুজব, কোনটা ধর্মীয় উন্মাদনা, কোনটা উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, কোনটা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কূটকৌশল, কোনটা সত্য, কোনটা ভুয়া, কোনটা বানোয়াট, কোনটা কল্প-কাহিনি, কোনটা অতিরঞ্জিত আবার কোনটা ডাহা মিথ্যা তা উদঘাটন বা জানাটাই যেন রূপকথার গল্পের মতো রহস্যময়!

প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে অনেক স্থানে প্রতিমা ভাঙচুর, সংঘর্ষ, প্রাণহানি ও অনেক মর্মবেদনা নিয়ে সনাতন বা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে যতটা জেনেছি, এই বছর দেবী দুর্গার এই মর্তে পিতা-মাতার গৃহে আগমন ঘোড়ায় চড়ে আর কৈলাসে ফিরবেন দোলায়। এটা কার দৈববাণী কিংবা কোন পণ্ডিত, পঞ্জিকাবিশারদ ও জ্যোতিষী বলেছেন তা আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রতিটি ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, আচার-রীতি ও ধর্মীয় কাজ সম্পাদনের সাথে স্থানীয় সামাজিক পরিবেশ ও রাজনৈতিক কলাকৌশল অদৃশ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। এ বছর দেবী দুর্গার আগমন ঘটক বা ঘোড়ায় চড়ে যার প্রতীকী অর্থ হচ্ছে অশান্তি, কলহ বিগ্রহ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এলোমেলো অবস্থা যা কিনা বর্তমান বিশ্বের টালমাটাল ও বেসামাল অবস্থাকেই নির্ণয় করে। আবার দেবী দুর্গা কৈলাসে ফিরবেন দোলায় বা পালকিতে যার অর্থ মড়ক বা মহামারি। বিশ্বব্যাপী করোনা ছোঁয়াচে ভাইরাসের দোর্দণ্ড প্রতাপ বা করোনাসূর-এর অশুভ রাজত্ব যে আগামীতেও বিরাজমান থাকবে এবং মানবজাতি এর করাল গ্রাস থেকে সহজেই যে রেহাই পাবে না তা অবধারিত।

আমার কাছে দুর্গাপূজা সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনি ও ইতিহাস পর্যালোচনা করে অনেক প্রশ্নের উত্তর অজানা ও অমীমাংসিত থেকেই যায়। তবুও জানা বিষয়গুলোকে পুনরায় উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি।

দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল বহু প্রাচীনকালেই। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে 'অকালবোধন' বলা হয়। কালিকা পুরাণ ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অনুসারে, রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় শরৎকালে দুর্গাকে পূজা করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, শরৎকালে দেবতারা ঘুমিয়ে থাকেন। অকালের পূজা বলে তাই এই পূজার নাম হয় 'অকালবোধন'। কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর রামায়ণে লিখেছেন, রাম স্বয়ং দুর্গার বোধন ও পূজা করেছিলেন। কথিত আছে যে, শক্তিশালী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয় নিশ্চিত করতে কৃপা লাভের জন্য শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০৮টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে দেবী দুর্গার চরণে নিবেদন করেন। রাবণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করার জন্যই দেবী দুর্গা ছলনা করে একটি নীল পদ্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু পূজার মুহূর্তে রাম দেখতে পেলেন একটি ফুল কম পড়েছে, তাই তিনি তাঁর নিজের নীলপদ্মের মতো একটি চক্ষুকেই নিবেদন করতে উদ্যত হলেন, তখন দেবী শ্রীরামচন্দ্রের হস্ত ধরে বাধা দিলেন। শ্রীরামের একাগ্রতা ও অসীম ভক্তির কাছে দেবী দুর্গার পরাজয় হলো, বাধ্য হয়ে দেবী দুর্গা শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণ বধের বর প্রদান করলেন।

শ্রীরামচন্দ্র লংকার অধিপতি রাবণকে বধ করার পর অপহৃত সীতাকে উদ্ধার করেন বটে কিন্তু তৎকালীন সমাজের কাছে সীতাকে সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে শ্রীরামচন্দ্র কি আর্য ছিল? না হলে তাঁর চোখজোড়া নীলপদ্মের মতো হয় কী করে? কেননা সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ইউরোপিয়ান ককেশীয়দের মধ্যে নীল চোখের অস্তিত্ব মেলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে নীল চোখের দেখা মেলা দুর্লভ ব্যাপার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে আর্য আর কে অনার্য? বাল্মীকির 'রামায়ণ'-এ সীতাহরণের পর মন্দোদরি একবার রাবণকে বলেছিলেন, 'আপনি এমন অনার্যের মতো আচরণ করছেন কেন?' রাবণ অনার্য হলে বা অনার্য-সংস্কৃতির প্রতিনিধি হলে নিশ্চয় মন্দোদরি তাঁকে এমন কথা বলতেন না। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ও ঋষিপুত্র হয়েও স্বভাবে রাক্ষস রাবণ সংযম শেখেননি। 'রাক্ষস' যেন এক স্বভাবের নাম। যে স্বভাবে ধৈর্য থাকে না, সংযম থাকে না। তাঁরও ছিল

না। ব্রাহ্মণসন্তান রাবণ ছিলেন একজন সংস্কৃতজ্ঞ, সুপণ্ডিত, মহাপুরোহিত, চার বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর অনায়াস দখল। মহাজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও রাবণ ছিলেন রাক্ষসগুণসম্পন্ন, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, নির্লজ্জ লোভী, বীরদর্পী, অহঙ্কারী ও নারী অপহরণকারী। এজন্যই বুঝি একটি কথা প্রবাদ-প্রবচনের মতো প্রচলিত আছে, 'যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।'

এই ভারতীয় উপমহাদেশে কে আর্য ও কে অনার্য তা নিয়েও অনেক বিতর্ক রয়েছে। ইংরেজ ম্যাক্সুলার সাহেব ১৮৫৯ সালে প্রথম আর্য-অনার্য তত্ত্ব আমদানি করেন। অথচ 'পুরাণ' ঘাঁটলে দেখা যায় তথাকথিত আর্য ব্রাহ্মণ বিয়ে করছেন শূদ্র মৎস্যকন্যাকে, ক্ষত্রিয় ভীম বিবাহ করছেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকে, অথবা অর্জুন নাগকন্যা উলূপীকে, এঁদেরকে সমাজ একঘরে করেছিল এমন তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। আর রামায়ণ তো রচিতই হয়েছিল অনার্য ব্যাধ কর্তৃক। মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব স্বয়ং ছিলেন শূদ্রমাতার সন্তান।

ঐতিহাসিকভাবে এটা কতটুকু সত্য বা ইংরেজ উপনিবেশবাদবিরোধী মতবাদ তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কথিত আছে যে, নিজেদের দখলদারত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য ইংরেজরা কখনও চায়নি যে ভারতীয় সমাজে, জাতীয় চরিত্রের বিকাশ ঘটুক। যে সময় ভারতীয় ঋষিগণ বেদ-উপনিষদের চর্চা করছেন, সেই সময় তাদের পূর্বপুরুষরা অসভ্য উলঙ্গ হয়ে কাঁচা মাংস চিবিয়েছেন, এটা ইংরেজদের কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। তাই মেকলীয় তত্ত্বের মাধ্যমে ম্যাক্সুলারের নেতৃত্বে তৈরি হলো আর্য-অনার্য তত্ত্ব। শিব, কালী, মনসা, রাবণ প্রমুখকে দেখানো হলো অনার্য হিসেবে, আর ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী দুর্গা প্রমুখকে আর্য সাজিয়ে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো হলো। যে 'তত্ত্ব'গুলো পরবর্তী কালে মার্ক্সবাদী ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক পরিপুষ্ট হয়েছে। এভাবেই বহিরাগত আর্যরা এই ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমিজ ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের অযাচিতভাবে অনার্য আখ্যা দিয়ে নিজেদের সংস্কৃতি 'জোর' করে চাপিয়ে দিয়েছিল।

এই ভারতীয় উপমহাদেশে কবে দুর্গাপূজার সূচনা ঠিক কবে হয়েছিল, তা নিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসবিদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, সম্ভবত পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে মুঘল আমল থেকেই দুর্গাপূজার প্রচলন ঘটে। যতটুকু জানা যায়, কারও মতে পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুর-মালদার জমিদার স্বপ্নাদেশের পর প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারও মতে, ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী তাহেরপুর

এলাকার রাজা কংশ নারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজার প্রবর্তক। আবারও কারও মতে, ১৬১০ সালে কলকাতার সুবর্ণ রায়চৌধুরী সপরিবারে দুর্গাপূজা চালু করেন। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের পর ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নবকৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। বিংশ শতকের শুরুর দিকে বাংলাদেশে দুর্গাপূজা সমাজের বিত্তশালী এবং অভিজাত হিন্দু পরিবারদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং এ শতাব্দীর শুরুর দিকে দুর্গাপূজা তার সর্বজনীনতার রূপ পায়।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদদৌলাকে হঠকারিতামূলক প্রহসনের যুদ্ধে পরাজয় ও নির্দয়ভাবে হত্যার পর রাজা নবকৃষ্ণদেব কেন দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিল? ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার চিহ্নিত বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বেনিয়ারা প্রায় আড়াইশ বছর এই বাংলার শাসন-শোষণ ও দখলদারত্বের রাজ কায়েম করে। ইতিহাসে এই বিষয়ে কার্যকারণ সম্পর্ক ও এর সপক্ষে তেমন কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য আমার জানা নেই!

এই ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলাভাষী অঞ্চলে চিরাচরিতভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তি করে যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো দেবী দুর্গা সকল অশুভ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। পর্বতের দেবতা হিমালয় (হিমাবন) ও তার স্ত্রী দেবী মেনকার কন্যা দেবী দুর্গা পার্বতী, উমা, গৌরী ও দশভুজাসহ ১০৮ নামে পরিচিত। একইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও ১০৮টি নাম রয়েছে। একেশ্বরবাদে ঈশ্বর এক, তিনি পরমব্রহ্ম। একই ঈশ্বরের দুই রূপ, হরি ও হর। যখন তিনি পালনকর্তা তখন হরি এবং যখন তিনি লয় কর্তা তখন হর। কৃষ্ণই সেই পরমব্রহ্ম। তিনি জীবের শোক, তাপ, দুঃখদুর্দশা হরণ করে জীবকে পরিত্রাণ দেন বলে তিনি 'হরি'।

পুরাকালে মহিষাসুর দেবগণকে একশতবর্ষব্যাপী এক যুদ্ধে পরাস্ত করে স্বর্গের অধিকার কেড়ে নিলে বিতাড়িত দেবগণ প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং পরে তাকে মুখপাত্র করে শিব ও নারায়ণের সমীপে উপস্থিত হলেন। মহিষাসুরের অত্যাচার কাহিনি শ্রবণ করে তারা উভয়েই অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলেন। সেই ক্রোধে তাদের মুখমণ্ডল ভীষণাকার ধারণ করল। প্রথমে বিষ্ণু

ও পরে শিব ও ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হতে এক মহাতেজ নির্গত হলো। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতাদের দেহ থেকেও সুবিপুল তেজ নির্গত হয়ে সেই মহাতেজের সঙ্গে মিলিত হলো। সু-উচ্চ হিমালয়ে স্থিত ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে সেই বিরাট তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল। কাত্যায়নের আশ্রমে আবির্ভূত হওয়ায় এই দেবী কাত্যায়নী নামে অভিহিতা হলেন। এই দেবী ছিলেন দেবী পার্বতীর অবতার। বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু কাহিনি মোতাবেক, অর্ধ মহিষ অর্ধ মানব মহিষাসুর যাকে হিন্দু পুরাণে অসুর অর্থাৎ দেবদ্রোহী অপদেবতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মহিষাসুরকে বধের মাধ্যমে দেবী দুর্গা হয়ে ওঠেন অশুভ শক্তির উপর শুভশক্তির বিজয়ের প্রতীক।

বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ করেছি যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড আর বিহার–এই তিন রাজ্যের আদিবাসীরা দুর্গার পদতলে ত্রিশূলবিদ্ধ মহিষাসুরকে হুদুড় দুর্গা নামে পূজা করে থাকে। লোককথা অনুযায়ী, আর্যদের দেবী দুর্গা এই সময়েই তাদের রাজা মহিষাসুরকে ছলনার মাধ্যমে হত্যা করেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বলশালী এবং প্রজাবৎসল এক রাজা। আদিবাসীদের প্রচলিত লোকগাথা অনুযায়ী, এক গৌরবর্ণা নারীকে দিয়ে তাদের রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল। এক গৌরবর্ণা নারীই যে মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন, তা হিন্দু পুরাণেও আছে। দেবী দুর্গার যে প্রতিমা গড়া হয়, সেখানে দুর্গা গৌরবর্ণা, টিকোলো নাক, যেগুলি আর্যদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। দুর্গার আরেক নাম সেজন্যই গৌরী। অন্যদিকে মহিষাসুরের যে মূর্তি গড়া হয় দুর্গাপূজায়, সেখান তার গায়ের রঙ কালো, কোঁকড়ানো চুল, পুরু ঠোঁট। এগুলো সবই অনার্যদের বৈশিষ্ট্য। যে আর্যরা ভারতে আসার পরে তারা কোনোভাবেই মহিষাসুরকে পরাজিত করতে পারছিল না। তাই তারা একটা কৌশল নেন, যাতে এক নারীকে তারা ব্যবহার করেন মহিষাসুরকে বধ করার জন্য। রাজা মহিষাসুরের সময়ে নারীদের অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হতো। এবং এরকম একজন রাজা কোনো নারীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন না, বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না, এ রকমটাই ধারণা ছিল আর্যদের। তাই তারা দুর্গাকে এই কাজে ব্যবহার করেছিলেন বলেই আদিবাসী সমাজ মনে করে। এ ধরনের মতবাদ ঐতিহাসিকভাবে কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও সত্য তা নিয়েও অনেক প্রশ্নের উত্তর অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

এই বছর আরও একটি চমকপ্রদ খবর হচ্ছে যে, ভারতে কেন্দ্রীয় ট্রাফিকিং পারসন্স বিলের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গের সোনাগাছি নিষিদ্ধ পল্লীর কর্মীরা এবার

তাদের দুয়ারের মাটি দিবে না দুর্গার প্রতিমা তৈরি করার জন্য। অথচ যুগ যুগ ধরে দুর্গা প্রতিমা গড়ার চারটি মূল উপাদান হচ্ছে–গাভির মূত্র, গোবর, ধানের শিষ ও পতিতালয়ের মাটি। চিরাচরিতভাবে মানুষ বিশ্বাস করে যে, মানুষের মধ্যে যে কামনা, বাসনা, লালসার বাস, পতিতারা তা নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেয়। তাঁরা নিজেদের অশুদ্ধ, অপবিত্র করে সমাজকে শুদ্ধ রাখতে চায় এবং পবিত্র রাখতে চায়। ফলে হাজার হাজার পুরুষের পুণ্যে নিষিদ্ধ পল্লীর মাটি হয়ে ওঠে পবিত্র– সে কারণেই এই মাটি দিয়ে গড়তে হয় দেবী মূর্তি–

আজ এই অবেলায় এসে আমার মনে হাজারো প্রশ্ন উঁকি দেয়। অনেকগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো, এই মরা আশ্বিন কার্তিক মাসে কেনই বা দেবী দুর্গা পদ্ম ফুল হাতে নিয়ে বাপের বাড়িতে নাইওর আসে? ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, কেনইবা শাস্ত্রবিশারদ, পণ্ডিত, পঞ্জিকাবিশারদ ও জ্যোতিষীগণ দেবী দুর্গাকে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে মর্তে নিয়ে আসে?

ঐতিহাসিকভাবে আবহ এই বাংলার জনপদে মরা আশ্বিন কার্তিক মাসে মানুষের কাজ থাকে না, ঘরে খাবার থাকে না। তাই কয়েক দশক আগেও মানুষ এই অভাবের সময়গুলোতে নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাদেরকে বাপের বাড়িতে নাইওর পাঠিয়ে দিত। ভরণপোষণ ও পরিবাবের বোঝা হিসেবে কন্যা সন্তানের বাল্য বিবাহের হিড়িক পড়ে যেত। এই করোনার দুর্যোগকালে স্কুল ও ছাত্রী উপবৃত্তি বন্ধ থাকায় দেশজুড়েই উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে বাল্যবিয়ের ঘটনা– ছোটবেলায় পূজার এই সময়ে পুষ্প, বাসন্তী ও মল্লিকা দিদিদের দেখেছি কোলের বাচ্চাসহ বাপের বাড়ি আসতে। তখন অর্থনৈতিক কার্যকারণ সম্পর্কে বুঝতাম না। এখন ভাবি, দেবী দুর্গা কেন অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পর আসে না! ওই সময়ে আসলে নাইওরে আসা পোয়াতি মেয়েটি ও বাচ্চা-কাচ্চাগুলো নবান্নের পিঠা পুলিসহ পুষ্টিকর খাবার পেত। এই বাংলার জনপদে মরা আশ্বিন কার্তিক মাসে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই সময় মঙ্গার ভরা মৌসুম। মানুষ বেঁচে থাকার জন্য কচু-ঘেঁচু ও বন-জংগলের আলু খেয়ে থাকত। বর্তমানে খাতা কলমে লাফিয়ে লাফিয়ে জিডিপি ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও উন্নয়নের মহাসড়কে অস্বস্তিকর যানজটের মতো ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিত্যদিনের সঙ্গী। বিশেষ করে করোনার সংক্রমণ চলাকালে উত্তরবঙ্গে দারিদ্র্য বেড়েছে এবং নতুন করে আবার মঙ্গা ফিরে এসেছে। এই বছর ২০২১ সালে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৬ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান

৭৬তম। এখনও ইদ্রিস আলীর মতো বৃদ্ধরা বয়স্ক ভাতা ও সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।

দেবী দুর্গার পদ্ম ফুল হাতে নিয়ে বাপের বাড়িতে নাইওর এসেও যেন শান্তি নেই। পাঁকে জন্মানো পদ্ম ফুল সত্য, সুন্দর ও অন্ধকারের মাঝে আশা ও আলোর প্রতীক। আজ লাল সবুজের এই দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উন্মাদনা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। শরতের এই নীল স্বচ্ছ আকাশে আজ সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ও দুর্যোগের ঘনঘটা যা বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা ছোঁয়াচে ভাইরাস থেকেও ভয়াবহ। 'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল' কিংবা মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলার চেতনা বিগত ৫০ বছরেও আমরা হৃদয়ে ধারণ, লালন ও পালন করতে পারিনি।

বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে ও আইনের দৃষ্টিতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ থাকলেও বছরের পর বছর চলতে থাকা বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে আমরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অন্তত মানুষ হিসেবে মানবিক মর্যাদাটুকুও দিতে পারিনি। কেননা বাংলাদেশে আইনের শাসনের ক্রমশ অবনতি হয়েছে। ২০২১ সালে আইনের শাসনের সূচকে ১৩৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৪তম।

পরিশেষে বলতে চাই, মাটির গড়া প্রতিমা সহজেই ভাঙচুর করা যায়, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক আদিবাসী জনগণকে প্রাণনাশের হুমকিধমকি দিয়ে ভিটে-মাটি ছাড়া ও দেশ ছাড়া করা যায়, কিন্তু যে মূল্যবোধহীন নীতি, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও মানবিকতা বিবর্জিত মনুষ্যত্ব নামক ঘাতক জীবাণু আমাদের কশেরুকা ও হৃৎপিণ্ডের সমস্ত অলিন্দ, নিলয় এবং আট কুঠরি ও নয় দরজার প্রতিটি শিরা-উপশিরা ও অস্থি-মজ্জায় বাসা বেঁধেছে এবং আমাদের চিন্তা-ভাবনায়, দর্শনে, মননে ও জীবন যাপনে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় উন্মাদনা ও বিদ্বেষমূলক বিষবৃক্ষের সংস্কৃতি অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে সেই অদৃশ্যমান অসুরকে বধ করব কীভাবে?

ঈশ্বর বেঁচে থাকেন ভক্তের হৃদয়ে

আজ আমেরিকার সময় সকাল বেলায় ফেসবুকের কল্যাণে জানতে পারলাম আমার অত্যন্ত একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ফা. লিও দেশাই ঈশ্বরের ডাকে ওপারে চলে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ে অনুভব করলাম একটি নক্ষত্রের পতন হয়েছে এবং তাঁর অনুপস্থিতি দিনাজপুর তথা বাংলাদেশের খ্রিষ্ট মণ্ডলীর নিকট এক অপূরণীয় ক্ষতি। অনেক আশা ছিল বাংলাদেশে গেলে তাঁর সাথে দেখা করব কিন্তু তা কোনোদিনই আর সম্ভব হবে না!

নব্বইয়ের দশকে ফা. লিও দেশাইকে আমি প্রথম দেখি দিনাজপুর জ্ঞান সাধনে। আমি তখন দিনাজপুর মাইনর সেমিনারীতে এবং দশম শ্রেণিতে পড়ি। ফা. লিও দেশাই সবেমাত্র জার্মানি থেকে ডক্টরেট পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তাঁর হাত দিয়েই দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশের পালকীয় কেন্দ্র জ্ঞান সাধনের যাত্রা শুরু হয়। বেশ কয়েক মাস আমরা বিশাল মাইনর সেমিনারীতে এক ছাদের নিচেই থাকতাম। তিনি নিচতলার একটি কক্ষে থাকতেন আর পাশের কক্ষ যেটা আমরা পড়াশোনার কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতাম তা তিনি একটি লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলেন। বিশাল বিশাল সব আলমারি বইপত্রে ভরা। আমার জীবনে স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া এত এত বইয়ের সমাহার এর আগে কখনও দেখিনি। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের সব ধরনের বই ছিল।

ফা. লিও দেশাইকে আমার খুব কাছে থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সকালের খ্রিষ্টযাগ, খাওয়ার সময় ও বিকালে খেলার সময় যখন তিনি হাঁটাহাঁটি করতেন–এই সময়গুলো ছাড়া তাঁর দেখা পাওয়া যেত না। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর কক্ষে পড়াশোনা করে সময় কাটাতেন। প্রথম প্রথম আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হলেও পরে যখন তিনি বলতেন যে, এই লাইব্রেরির সব বই তাঁর পড়া প্রায় শেষ তখন খুব বিস্মিত হতাম! কোনো কোনো দিন আবার ভোরবেলা বাইসাইকেল চালিয়ে দিনাজপুর শহরের মধ্যে মিশা দিতে যেতেন। জীবনে কোনোদিন তাঁকে মোটরবাইক চালাইতে দেখিনি

এবং শুনেছি শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি তাই করে গেছেন। তাঁর বই পড়ার প্রতি প্রচণ্ড নেশা দেখেই আমার মধ্যে একটু একটু করে বই পড়ার আগ্রহ তৈরি হয় এবং একটার পর একটা বই পড়তে থাকি। বেশ কয়েক মাস পর আমরা বিশাল মাইনর সেমিনারী ছেড়ে একটা পুরাতন ভবনে স্থানান্তর হই এবং সামনে এসএসসি পরীক্ষা থাকায় পাঠ্যবই পড়ায় মনোযোগী হই।

১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর পোস্ট ম্যাট্রিক কোর্সের জন্য আবারও বিশাল মাইনর সেমিনারীতে থাকার সুযোগ হয় এবং সেখানে সারা বাংলাদেশের সব ধর্ম প্রদেশ থেকে প্রায় ৯০ জন একসঙ্গে পাঁচ মাস থাকি। এই সময় আবারও বই পড়ার প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। তিনি আমাদের পুরাতন নিয়মের বাইবেল, বিশেষ করে পঞ্চ পুস্তক যা ছিল অত্যন্ত জটিল ইতিহাস। কিন্তু তিনি অনেক সহজ করে পড়াতেন। আমার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সময় আমি কাটিয়েছে তাঁর খুব কাছাকাছি থেকে। আমি হলফ করে বলতে পারি যে তাঁকে দেখেই আমি বই পড়ার প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হই যা পরবর্তী সময়ে আমার শিক্ষা জীবনে অনেক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এর পরও তাঁর সাথে অনেকবার দেখা হয়েছে এবং অনেক ধরনের কথ াবার্তা ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। আমার শিক্ষা জীবনেও অনেক পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন জ্ঞান তাপস ও নিভৃতচারী। এত বড় মাপের জ্ঞানী ও গুণী মানুষ হিসেবে তাঁর কোনো অহংকার ছিল না। ঈশ্বরের একজন আজ্ঞাবহ ও নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। বাংলা, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা ছাড়াও তিনি দিনাজপুর অঞ্চলের সব আদিবাসী ভাষা জানতেন এবং সবার সাথে মিশতে পারতেন।

এই অবেলায় একটি কথাই বারবার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই রকম একজন জ্ঞানী ও গুণী মানুষের দিনাজপুর তথা বাংলাদেশের খ্রিষ্ট মণ্ডলীর নেতৃত্বে বড়ই প্রয়োজন ছিল। হয়তো তিনি ঈশ্বরের একজন আজ্ঞাবহ সেবক হিসেবে নিভৃতচারীর সাধারণ জীবন বেছে নিয়েছিলেন কিংবা তাঁর জ্ঞানের বিশালতা, দূরদর্শিতা ও গভীরতা পরিমাপ করার যোগ্যতা আমাদের ছিল না! আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলোকে ক্ষমা করে দিয়ে ওপারে ভালো থাকবেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ফা. লিও দেশাই।

স্মৃতির পাতায় অম্লান সাইফুদ্দিন সবুজ ভাই

অকালেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন সবুজ ভাই। আমার সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল মাত্র এক দিন। ২০০৬ সালে প্রতিবেশী ও বাণী দীপ্তির রেকর্ডিং স্টুডিওতে কিন্তু তারিখটা আমার আর মনে নেই। খুব সম্ভবত এপ্রিল কিংবা মে মাসের দিকেই হবে। কে জানত সেটাই হবে তাঁর সাথে শেষ দেখা, আর জীবনে কোনোদিন দেখা হবে না।

আমার প্রতিবেশী ও বাণী দীপ্তির রেকর্ডিং স্টুডিওতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ কারিতাসের একটি প্রামাণ্য চিত্র–অ Journey to Love (একটি ভালোবাসার যাত্রা)-তে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। কারিতাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ ভালোবাসা। বাংলাদেশ কারিতাস একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দীর্ঘদিনের কাজের অনেক সফলতা ও বর্তমান কাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য এই প্রামাণ্য চিত্রটি তৈরি করা হয়। যার গ্রন্থনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন প্রিয় সবুজ ভাই।

আমাকে এই প্রামাণ্য চিত্রটিতে অন্তর্ভুক্ত করার পেছনের গল্পটি এ রকম–আমি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত আমাদের গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করি; যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিসের আওতায় 'অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প'-এর অধীনে পরিচালিত হতো। এর পর ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (রংপুর)-এর বোর্ডিংয়ে থেকে বলদিপুকুর হাই স্কুলে পড়াশোনা করি এবং অষ্টম শ্রেণিতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করি। ১৯৯১ সালে দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপ্স হাই স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের অধীনে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করি। দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৯৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি

হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতাসের প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আইসিডিপি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে যোগদান করি। এরই মধ্যে আমি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি লাভ করি। ২০০৩-২০০৫ সালে আমি অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ইন পাবলিক পলিসির পড়াশোনা সম্পন্ন করি। বাংলাদেশে ফেরার পর আবারও বাংলাদেশ কারিতাসের প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য পারলাম (ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকার) প্রকল্পে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে ২০০৭ সাল পর্যন্ত চাকরি করি।

এই ছিল আমার গ্রামের একজন কৃষক পরিবারের সন্তান হিসেবে এবং বাংলাদেশ কারিতাসের প্রকল্পের একজন ছাত্র ও কর্মী হিসেবে সামান্য ক্ষুদ্রতম সফলতার গল্প। যদিও আমি এখনও সফল হতে পারিনি। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এনজিওগুলো প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদি করার জন্য দেশি ও বিদেশি দাতা সংস্থার কাছে কিছু সফলতার প্রতিবেদন পেশ করে থাকে যাতে ভবিষ্যতে দাতা সংস্থার অনুদান অব্যাহত থাকে।

আমি এই প্রামাণ্য চিত্রটির কথা অনেক দিন ভুলেই ছিলাম। কিন্তু বন্ধুবর সুমন করাইয়ার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে সবুজ ভাইয়ের অকাল প্রয়াণের খবরটি জানার পর মনটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। যদিও আমার সাথে মাত্র এক দিনের পরিচয়, কিন্তু তাঁর নামটি আমি অনেক আগে থেকেই জানি। যখন থেকে প্রতিবেশী সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়তে শুরু করেছি ঠিক তখন থেকেই। বাংলাদেশের খ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পরিচালনাধীন বাণী দীপ্তির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগের সুদীর্ঘ সময়ের সুযোগ্য প্রযোজক ছিলেন তিনি। একজন মুসলিম হয়েও বাংলাদশের খ্রিষ্টান সমাজে তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। আজ তাঁর মহাপ্রয়াণে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি এবং তাঁর শোকার্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি। চির শান্তিতে বিশ্রাম করুন প্রিয় সবুজ ভাই আপনার মেঘের উপরের বাসায়।

ওপারে ভালো থাকবেন রবিন দা

উত্তরবঙ্গের আদিবাসী অধিকার আদায়ের কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথ সরেন গত ১৩ জানুয়ারি প্রথম প্রহরে নিজ বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করে ওপারে চলে গেছেন! জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি বরীন্দ্রনাথ সরেন সারা জীবন আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছেন। একটি কথা তিনি সব সময় বলতেন, 'আদিবাসীদের জীবন যেন প্রতিশ্রুতি আর প্রতারণার জীবন।'

আমার সাথে রবীন্দ্রনাথ সরেনের ভালো যোগাযোগ ছিল। আমি তাকে দাদা বলেই সম্বোধন করতাম। আমেরিকায় আসার পরও কয়েকবার তাঁর সাথে ফোনে কথা হয়েছে। তাঁর অসুস্থতার খোঁজখবর আমি ফেসবুকের (মানিক ও খোকন) কল্যাণে জানতাম। একটি কথা আমি প্রায়ই দাদাকে বলতাম যে, আপনি/আপনারা (জাতীয় আদিবাসী পরিষদ) ধর্ম নিয়ে অহেতুক কোনো দ্বন্দ্ব বা বিভাজন সৃষ্টি করবেন না। কেউ খ্রিষ্টান, অখ্রিষ্টান কিংবা কেউ যদি কোনো ধর্মই পালন না করে কিন্তু আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দেয়, তাদেরকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করুন। এতে সংগঠন শক্তিশালী হবে এবং আন্দোলনও জোরদার হবে। কিন্তু তাঁর সতীর্থ তরুণ ছোকরারা এখনও এ বিষয় বুঝতে নারাজ!

একটি কথা এখানে স্মৃতিচারণ না করলেই নয়। ২০১৬ সালে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্ম উচ্ছেদ ঘটনার উপর ঢাকা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন শেষে আমরা কয়েকজন রাস্তার পাশে টং দোকানে চা খাচ্ছিলাম। সেই সময় রবিন দা বললেন যে, বাদশা ভাই কোনো ফোন ধরছেন না। তিনিও বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির একজন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। আমি তখন বললাম, আপনারা ফকিরকে বাদশা বানালেন (বাদশা ভাই তখন আওয়ামী লীগের সমর্থনে এমপি) এখন আর আপনাদের কোনো খোঁজখবর রাখে না! এইবার দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-২ (সদর) আসনে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশাকে

হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ে গেল ছোটবেলার কথা। বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট দিলেই আমার বাবাকে বলতাম আমি ফার্স্ট হয়েছি। বাবা বলতেন, 'চোরের উপর চোর আছে, ওস্তাদের উপর ওস্তাদ আছে, গুরুর উপর গুরু আছে।' রাজশাহী-২ (সদর) আসনের নির্বাচনী ফলাফল বলে দেয় যে, বাদশার উপর বাদশা আছে।

আজ রবীন্দ্রনাথ সরেন আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি ছিলেন অধিকার বঞ্চিত, অত্যাচারিত, প্রতারিত প্রান্তিক মানুষের আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশের আদিবাসীদের মনের কোঠায় একজন লড়াকু বাদশা হিসেবে স্মৃতিতে চির জাগরূক হয়ে থাকবেন। ওপারে ভালো থাকবেন রবিন দা!

পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহার :
ইতিহাস সব সময় বিজয়ীর কথা বলে, পরাজিতের নয়

গত বছর থেকে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক ও নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াতে জোরালো আলোচনা চলছে। আমিও কৌতূহলী হয়ে এই বছরের (২০২৪) পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি। প্রাথমিক স্তরের চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বইয়ে (পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯) পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা আছে :

"প্রাচীন এ বিহার একসময় খালি পড়ে থাকে। অনেকে মনে করেন যুগ যুগ ধরে উড়ে আসা ধুলাবালি ও মাটি এটির চারিদিকে জমতে থাকে। একসময় মাটির স্তূপে এটি ঢাকা পড়ে পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পাহাড়পুর।"

বাঃ কী চমৎকার ইতিহাসের বয়ান! যদিও উল্লেখ আছে ১৪শ বছর আগে পাহাড়পুর বিহার ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের উচ্চ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। এই বিহারটির আর এক নাম সোমপুর বিহার বা সোমপুর মহাবিহার যা নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল প্রায় ১২শ বছর আগে এটি নির্মাণ করেন, যেখানে ছিল ১৭৭টি কক্ষ ও ৮০০ মানুষের থাকার উপযোগী। কী কারণে এই বিশাল স্থাপনা একসময় খালি পড়ে থাকে তা অনুসন্ধান করাই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য।

উইকেপেডিয়ার সূত্র ধরে যা জানা যায়, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং এটি ছিল ইসলাম-পূর্ব বাংলার একটি প্রাচীন আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা দ্বিতীয় ধর্মপালের আমলে ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হয়। এই ভারতীয় উপমহাদেশে পাল রাজাদের আমলে বেশ কিছু বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে বিক্রমশীলা, নালন্দা,

পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহার, অদান্তাপুরা ও জগদ্দল বিহার (নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলায়) অন্যতম। এই বিহারগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ ছিল এবং ছাত্র ও শিক্ষক এক বিহার থেকে অন্য বিহারে বদলি হতে পারত। এই সব বিহারে বেদ, শিল্পকলা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, সংগীত, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা ও শারীরবিদ্যা পড়ানো হতো। জ্ঞান আচার্য অতীশ দীপঙ্কর এই পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহারের ছাত্র ছিলেন বলে জানা যায়। আজকের যুগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে ক্রেডিট ট্রান্সফার তা অনেক আগেই এই বৌদ্ধ বিহারগুলোতে প্রচলিত ছিল। অনেকেই মনে করেন, সেন রাজাদের আমলে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জনসংখ্যার ব্যাপক স্থান পরিবর্তন ও মুসলিম আক্রমণের কারণে এই বিহারগুলো জনশূন্য ও বন্ধ হয়ে যায়।

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী নামক একজন তুর্কি-আফগান আক্রমণকারী যার কিনা অনেক শখ ছিল তুর্কি সেনাবাহিনীতে যোগদান করার কিন্তু তাঁর দুটো হাত তাঁর দেহের তুলনায় অস্বাভাবিক বড় থাকায় তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল যুদ্ধ ও দেশ বিজয়ের। বখতিয়ার খলজী ১২০৩ সালে মাত্র ১৮টি ঘোড়সওয়ার নিয়ে বাংলা আক্রমণ করলে তৎকালীন রাজা লক্ষ্মণ সেন কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করেই পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। বখতিয়ার খলজীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বিজয়ের মাধ্যমে এই ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশ ও মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনাপাত হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে নালন্দা মহাবিহার (বিহারের পটনায়)) ছিল বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় যা খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে নির্মিত হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক ১১৯৭-১২০৫ সালের মধ্যে এই নালন্দা মহাবিহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই মহাবিহার ধ্বংসের পিছনে এক নারকীয় ও লোমহর্ষক কাহিনি জড়িত রয়েছে।

কথিত রয়েছে যে, এক সময় বখতিয়ার খলজী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দরবারের হেকিম ও কবিরাজ কিছুতেই তাকে সুস্থ করে তুলতে পারছিলেন না। এই দুঃসময়ে কেউ একজন তাঁকে প্রস্তাব দিল যে, তিনি যেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাহুল শ্রী ভদ্রের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ইসলামী চিকিৎসার উপর অনেক বেশি গর্ব করতেন

এবং বিধর্মী কারো কাছ থেকে চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকলে তিনি অন্য কোনো উপায় না পেয়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রাহুল শ্রী ভদ্রকে জোরপূর্বক ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে শর্ত দিলেন যে কোনো ওষুধ ছাড়াই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে হবে। অধ্যক্ষ রাহুল শ্রী ভদ্র কৌশলে বখতিয়ার খলজীকে একটি কোরআন পড়তে বললেন এবং কিছু দিনের মধ্যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। কেননা অধ্যক্ষ রাহুল শ্রী ভদ্র কোরআনের পাতায় পাউডারের মতো ওষুধ দিয়ে রেখেছিলেন।

বখতিয়ার খলজী পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পর বুঝতে পারলেন যে, ভারতীয় ডাক্তার ও পণ্ডিতেরা তাঁর দরবারের হেকিম ও কবিরাজ থেকে অনেক বেশি জানে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বৌদ্ধ-আয়ুর্বেদিক জ্ঞান ও বিদ্যাকে এই দেশের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটন করবেন। যে কথা সেই কাজ। তিনি তাঁর সেনাবাহিনী দ্বারা নালন্দা মহাবিহারে আগুন লাগিয়ে দিলেন এবং এই বিহারের অনেক জ্ঞানী, গুণী শিক্ষক ও পণ্ডিতকে হত্যা করেন। কথিত আছে যে, নালন্দা মহাবিহারের লাইব্রেরিতে ৯ মিলিয়ন (নব্বই লাখ) বই ছিল এবং এই লাইব্রেরি তিন মাসেরও অধিক সময় ধরে পুড়েছে। ধ্বংস হয়েছে প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১১৯৭-১২০৫-এর মধ্যে বখতিয়ার খলজীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা বিজয়ের সময় বিক্রমশীলা, নালন্দা, পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহার, অদান্তাপুরা ও জগদ্দল বিহারগুলো ধ্বংস করা হয়। বখতিয়ার খলজীর সেনাবাহিনী দ্বারা এই সব বিহারের জ্ঞানী, গুণী শিক্ষক ও পণ্ডিতকে হত্যা, প্রাণভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের তিব্বতে পলায়ন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জনসংখ্যার ব্যাপক স্থান পরিবর্তনের ফলে এই বিহারগুলো জনশূন্য ও বন্ধ হয়ে যায়। তাই এই প্রাচীন পাহাড়পুর-সোমপুর মহাবিহার একসময় খালি পড়ে থাকে!

মরুর বুকে আরব বিশ্বে সংখ্যালঘু জনগণ

আরবি ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশসমূহকেই আরব দেশ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতির মরুর বুকে মধ্যপ্রাচ্যের আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ যেমন–সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও কুয়েতকেই মূলত আরব বিশ্ব বলা হয়ে থাকে। এর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমন–ইরাক, ইরান, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, মিশর এবং এমনকি ইসরায়েল ও প্যালেস্টাইনও ভূ-প্রকৃতিগতভাবে আরব বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমানে চলমান ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন যুদ্ধের ফলে পুরো আরব বিশ্বেই এক অচলাবস্থা বিরাজ করছে। অথচ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই অঞ্চলে রয়েছে অনেক প্রাকৃতিক নদ-নদী ও ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং অনেক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান যেমন–জর্ডান নদী, গালিল সাগর ও মৃত সাগর এবং অনেক পাহাড় ও উপত্যকা। পৃথিবীর এক আশীর্বাদময় এক অঞ্চল যেখানে রয়েছে বাইবেলের বিখ্যাত চরিত্র আব্রাহাম, ইসাহাক, মোশী ও দাউদের আবাসস্থল ও স্মৃতিবিজড়িত স্থান। যীশু খ্রিষ্টের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বাণী প্রচার ও মৃত্যু হয় এই এলাকায়। তাই জেরুজালেম খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ফলে অবিরত সেখানে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। প্রায় ৭০ বছর ধরে সেখানে চলছে মানবিকতার এই বিপর্যয়। ২০২৩ সালের ৭ই অক্টোবর ভোরবেলা হামাস ইসরায়েল আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই প্রাণঘাতী যুদ্ধে এ পর্যন্ত প্যালেস্টাইন-গাজার প্রায় ত্রিশ হাজার এবং ইসরায়েলের প্রায় দুই হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই মুহূর্তে প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় বাইবেলের দুধ ও মধুর দেশে মানবিকতার বিপর্যয় আরও ঘটতেই থাকবে!

আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশসমূহ মূলত ইসলাম (সুন্নি) ধর্মের অনুসারী। বর্তমানে এই দেশগুলোতে তথাকথিতগণতন্ত্র কোনোটাতেই নেই। কোথাও বাদশা, কোথাও আমির আবার কোথাও সুলতান দ্বারা পরিচালিত এই দেশগুলোতে পারিবারিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবী শ্রমিকেরাই জাতিগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে এবং তাঁদের ছাড়া এই দেশগুলো অনেকটাই অচল।

পারস্যের ইরান একটি শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশ (শিয়া ৮৮% এবং সুন্নি ১১%)। এ ছাড়াও সেখানে রয়েছে আরমেনিয়ান ও আসিরিয়ান খ্রিষ্টান–যাদের সংখ্যা প্রায় তিন লাখ এবং জরাস্ত্র প্রায় আড়াই লাখ। ইরানি পার্লামেন্ট মজলিস (২৯০)-এ ৫টি আসন সংরক্ষিত আছে সংখ্যালঘু জনগণের জন্য (আরমেনিয়ান খ্রিষ্টান-২, আসিরিয়ান খ্রিষ্টান-১, জরাস্ত্র-১)। অবাক করার বিষয় হচ্ছে, যে ইসরায়েলের সাথে ইরানের বৈরী সম্পর্ক সেখানে মাত্র দশ হাজার ইহুদির জন্য ইরানি পার্লামেন্ট মজলিসে একটি আসন সংরক্ষিত আছে!

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ (শিয়া ৫৫% এবং সুন্নি ৪০%)। ইরাকে আসিরিয়ান খ্রিষ্টান আছে যাদের সংখ্যা প্রায় ২.১ মিলিয়ন, যা ইরাকের জনসংখ্যার ৩% এবং এখানেও আট হাজারের মতো ইহুদি আছে। ইরাকের পার্লামেন্টের ৩২৯ আসনের মধ্যে ৫টি আসিরিয়ান খ্রিষ্টান, ১টি কুর্দি, ১টি ইয়াজিদ, একটি সাবাক ও একটি মান্দিয়ানদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

লেবানন দেশটার কথা মনে এলেই চোখে ভাসে সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিজবুল্লার কথা। লেবাননের পার্লামেন্টের ১২৮ আসনের মধ্যে ৬৪টি খ্রিষ্টান এবং ৬৪টি মুসলিম (শিয়া, সুন্নি, আলাওয়াইত, দ্রুজ)-দের মধ্যে স্পষ্টভাবে বণ্টন করা। লেবাননের পার্লামেন্টের স্পিকার একজন শিয়া মুসলিম, প্রধানমন্ত্রী একজন সুন্নি মুসলিম এবং প্রেসিডেন্ট একজন মেরনাইট খ্রিষ্টান, যা সাংবিধানিকভাবে পাকাপোক্তভাবে বণ্টন করা আছে।

জর্ডান অনেকটা রাজতন্ত্র হলেও দেশটার একটি পার্লামেন্ট আছে। সিনেটের ৬৫ জন সরাসরি দেশটির রাজা কর্তৃক মনোনীত এবং ১৩০টি প্রতিনিধি সভার ৯টি আসন খ্রিষ্টান, চেচেন ৩টি এবং ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

মিশরের পার্লামেন্টে ৫৯৬টি আসনের মধ্যে কপটিক খ্রিষ্টানদের জন্য ২৪টি আসন এবং ৭০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। সিরিয়ার পার্লামেন্টে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল এবং বর্তমানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত নেই।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, রাষ্ট্রীয় আইন ও সাংবিধানিকভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য পার্লামেরন্ট নির্দিষ্ট কোনো আসন সংরক্ষিত করলেই মানুষের মানবাধিকার ও সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত হয় না। অনেক আলোচনা ও সমালোচনা থাকার পরও আরব বিশ্বের দেশগুলো তাঁদের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ ও সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে!

অথচ ধর্ম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে চিন্তা, চেতনায়, মননে ও দর্শনে অত্যন্ত সুকৌশলে ও দীর্ঘ মেয়াদি নীল-নকশার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সরকারি কাঠামো, সরকারি দলিলপত্র, পাঠ্য পুস্তক ও আইন থেকে আড়াল করে রাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে তাদের অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলীন করার একটি অশুভ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এর মূলে রয়েছে কাঠামোগত বৈষম্য (structural discrimination)। এ ধরনের সূক্ষ্ম কাঠামোগত বহিষ্কার বা বর্জন (structural exclusion) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সরকারি কাঠামোর কেন্দ্র (centre) থেকে প্রান্তিক পরিধি (ঢ়বৎরঢ়যবৎু)-তে সুকৌশলে অস্তিত্ব নির্মূলের জন্য (structural elimination) ঠেলে দিয়ে একটি দৃশ্যমান বিভাজন (divisive society) ও প্রান্তিক সামাজিক অবস্থান (marginalized community) তৈরি করার অপচেষ্টা চলছে। একমাত্র মূল স্রোতঃধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (mainstreaming and inclusion)-এর মাধ্যমে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমান নাগরিক অধিকার, সমতা ও ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত হবে!

বাইবেলের দুধ ও মধুর দেশে আজ সংঘাত ও প্রাণহানি

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament) অনুযায়ী আজকের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' (Promised Land)। পুরাতন নিয়মের যাত্রা পুস্তকের বর্ণনা মতে, মোশীর নেতৃত্বে ইহুদি জাতিকে মিশরের ফারাও রাজার দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে মিশর থেকে সিনাই উপত্যকা হয়ে কানান (Canaan) দেশে নিয়ে এসেছিল। যীশু খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইন, সিরিয়া ও জর্ডান অঞ্চল নিয়ে কানান (Canaan) দেশ বা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। কেননা তারাই ছিল ঈশ্বরের 'মনোনীত সম্প্রদায়' (Chosen People)। মহাপ্রভু তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে দুধ ও মধুর এই দেশে (Land of Milk and Honey) তারা সুখে শান্তিতে চিরকাল বসবাস করবে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এই অঞ্চলে রয়েছে অনেক প্রাকৃতিক নদ-নদী, ও ফল-ফসলের প্রাচুর্য এবং অনেক ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান যেমন–জর্ডান নদী, গালিল সাগর ও মৃত সাগর এবং অনেক পাহাড় ও উপত্যকা। পৃথিবীর এক আশীর্বাদময় এক অঞ্চল যেখানে রয়েছে বাইবেলের বিখ্যাত চরিত্র আব্রাহাম, ইসাহাক, মোশী ও দাউদের আবাসস্থল ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান। যীশু খ্রিষ্টের জন্ম, বেড়ে ওঠা, বাণী প্রচার ও মৃত্যু হয় এই এলাকায়। তাই জেরুজালেম খ্রিষ্টান, ইহুদি ও মুসলিমদের কাছে এক পবিত্র তীর্থস্থান।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেখানে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধের ফলে অবিরত সেখানে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটছে। প্রায় ৭০ বছর ধরে সেখানে চলছে মানবিকতার এই বিপর্যয়। মানবিকতার এই ভয়াবহ ঘটনাগুলো আলোকপাত করার আগে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম সম্পর্কে একটু জেনে নিই!

ঊনবিংশ শতকে এসে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কাজ ও বাণিজ্য করার জন্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিপীড়নের শিকার ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে ফিরে যাওয়ার একটা তৎপরতা শুরু হয়। ১৮৯৭ সালে হাঙ্গেরীয় সাংবাদিক, আইনজীবী ও নাট্যকার থিওডোর হারজেল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন

বৈশ্বিক জায়নবাদী সংস্থা (World Zionist Organization)। এই জায়নবাদ আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। জায়নবাদীরা ইহুদি রাজ্য গড়ে তুলতে প্রথমে তুর্কি সুলতানের কাছে ফিলিস্তিন বিক্রির প্রস্তাব দেয়। তখনকার সুলতান আব্দুল হামিদ তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে জায়নবাদীরা ভিন্ন কৌশলে হাঁটতে শুরু করে। তারা ধনী ইহুদিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বহিরাগত ইহুদিদের জন্য ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে জমি কেনা শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তুরস্ক থেকে গ্লিসারিন কিনত ব্রিটিশরা। সমরাস্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই গ্লিসারিন। বিশ্বযুদ্ধের সময় তুরস্ক গ্লিসারিন বাণিজ্য বন্ধ করে দিলে বিপাকে পড়ে ব্রিটিশরা। ইহুদি বিজ্ঞানী ওয়াইজম্যান গ্লিসারিনের বিকল্প এসিটোন আবিষ্কার করেন এবং এর ফর্মুলা ব্রিটিশদের কাছে তুলে দেন। ওয়াইজম্যান এর বিনিময়ে ব্রিটিদের কাছে ইহুদিদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবি করেন। ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড আর্থার জেমস বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদি নেতা লিওনেল ওয়াল্টার রথসচাইল্ডকে লেখা ৬৭ শব্দের চিঠিতে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন, যা বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration, November 2, 1917) নামে পরিচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর ফিলিস্তিনসহ আরবের বেশ কিছু অঞ্চল চলে যায় ব্রিটিশদের হাতে। ব্রিটিশরা ১৯১৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করে এবং ১৯২০ সালে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত যা ছিল তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি অভিবাসী ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ৩৫ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯৩১ সালে ইহুদিদের এই সংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৮০ হাজারে পৌঁছায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হলোকাস্টে (Holocaust) প্রায় ৬০ লাখ ইহুদিকে নিধন করা হয় মূলত জার্মানির হিটলারের পরিকল্পনায়। এই হলোকাস্ট ফিলিস্তিনের মাটিতে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করে তোলে। ফলে ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর সদ্য গঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে দুই ভাগ করার

প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। বেন গুরিয়নের নেতৃত্বে জায়নবাদীরা স্বদেশের মাটি থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করার জন্য তৈরি করে প্ল্যান 'দালেত' এবং ১৯৪৮ সালে ইহুদিদের সংখ্যা সেখানে ৬ লাখে উন্নীত হয়। দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল আরব নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব ছিল না যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ ও সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট ইহুদিদের প্রতিরোধ করা। প্রাসঙ্গিক ক্রমে, ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র ঘোষিত হয়। সেদিন রাত ১২টায় ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ব্রিটেন সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সীমানা নির্ধারিত হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবানুসারে। পরদিন আরব দেশগুলোর ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায়। যুদ্ধে অসংগঠিত আরবরা পরাজিত হলে জর্ডান ও সিরিয়ার বড় অংশ দখল করে নেয় ইসরায়েল। সেই থেকে প্রায় ৭০ বছর ধরে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলে চলছে মানবিকতার বিপর্যয়।

অতিসম্প্রতি, ৭ই অক্টোবর ২০২৩ ভোরবেলা হামাস ইসরায়েল আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই প্রাণঘাতী যুদ্ধে এই পর্যন্ত (৮ই নভেম্বর, ২০২৩) প্যালেস্টাইন-গাজার প্রায় দশ হাজার এবং ইসরায়েলের প্রায় দুই হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। বাইবেলের দুধ ও মধুর দেশ এখন মৃত্যু উপত্যকায় পরিণত হয়েছে। যে কোনো যুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অনেক নিরীহ ও নিষ্পাপ মানুষের অহেতুক প্রাণহানি ও মানবিকতার চরম বিপর্যয় ঘটে। কারণ আধুনিক এই পৃথিবীতে সশস্ত্র ও সহিংস আন্দোলন কোনোদিন কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাধীনতার নায়ক মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন (Non-Violence Movement) ভারতের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৬৩ সালে আমেরিকায় মারটিন লুথার কিং নাগরিক ও মানবাধিকার আন্দোলন (Civil Disobedience Movement) করেন এবং এর ফলে আমেরিকার কালো মানুষেরা আইনগতভাবে সমান নাগরিক অধিকার লাভ করে। অধিকার আন্দোলনের রূপরেখা অহিংস ও শান্তিপূর্ণ না হলে পৃথিবীব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘাত ও যুদ্ধ চলতেই থাকবে। তাই এই মুহূর্তে প্যালেস্টাইন-ইসরায়েল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব নেতাদের হস্তক্ষেপ ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। তা না হলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় বাইবেলের দুধ ও মধুর দেশে মানবিকতার বিপর্যয় আরও ঘটতেই থাকবে!

মায়াবী মহুয়ার মাদকতাময় জীবনের ছন্দপতন

সৃষ্টির ঊষা লগ্নে আদম ও ইভ শয়তানের প্ররোচনায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে (অনেকের মতে নেশা জাতীয় আপেল বা গন্ধম ফল) স্বর্গসুখ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন যে, 'এখন থেকে তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা নির্বাহ করবে।' সেই থেকেই মানুষের অদৃশ্য নিয়তি। আজ মানুষ পৃথিবীর যেখানেই বাস করুক না কেন বাঁচার জন্য এবং এক মুঠো সুখের আশায় দিবানিশি কতই না ক্লান্তিকর পরিশ্রম করতে হয়!

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নশ্বর মানুষকে কতই না কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য একদিকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে, অন্যদিকে বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা ও বিভিন্ন ধরনের জাদুকরী ও মায়াবী মাদক, অন্যান্য রকমারি ও বাহারি নেশা জাতীয় পণ্যের সমাহার ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, মদ বা অ্যালকোহল মূলত তিন ধরনের যেমন–ইথানল (যাকে ইথাইল অ্যালকোহলও বলা হয়), মিথানল (যাকে মিথাইল অ্যালকোহল, উড অ্যালকোহল বলা হয়) এবং রেকটিফায়েড স্পিরিট। আদতে এই রাসায়নিক উপাদানগুলো তৈরি করা হয়েছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে। শিল্প-কারখারখানার জন্য ও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ তৈরির জন্য ইথানল এবং কাঠ বার্নিশে ও বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা জন্য মিথানল।

পরবর্তী সময়ে মানুষের নেতিবাচক উদ্ভাবনী শক্তির কারণে শিল্প-কারখানার জন্য আমদানিকৃত ইথানল পানের অনুপযোগী করতে এর সাথে মিথানল মিশ্রিত করে বাণিজ্যিকভাবে মাদকে পরিণত করা হয়। আর এখন এই মাদকগুলো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই সহজলভ্য। যেমন–বাংলাদেশে মদ পান করা নিষিদ্ধ অথচ ঢাকা শহরে রয়েছে প্রচুর বৈধ ও অবৈধ বার। সেখানে দেশি-বিদেশি মদ ও ইয়াবাসহ অন্যান্য রকমারি ও বাহারি নেশা জাতীয় ট্যাবলেট মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হয়।

নিষিদ্ধ দ্রব্য ও বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ দুর্নিবার। কখনও শিশুসুলভভাবে আবার কখনও এই জীবনের দুঃখ-অবসাদ, পারিবারিক অশান্তি এবং ক্লান্তি অবসানের জন্য মায়াবী মাদকের আশ্রয় নিয়ে একটি তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায়। এ প্রসঙ্গে একটা জনপ্রিয় গানও আছে, 'নেশার লাটিম ঝিম ধরেছে, চোখের তারায় রং জমেছে, এখন কোনো দুঃখ নেই, নেই কোনো ভাবনা, দুঃখ হলে ভাবনা বাড়ে, ভাবনা হলেই দুঃখ বাড়ে, এমন করেই দিন যদি যায় যাক না।'

দুঃখ-অবসাদ, ভালো-মন্দ এবং পাপ-পুণ্য এই পৃথিবীর মানুষের অনুষঙ্গ। নিরবচ্ছিন্ন সুখ, শান্তি ও ভালোবাসা মর্তের মানুষের জীবনে কোনো এক অদৃশ্য কারণে কখনোই চিরস্থায়ী হয় না। এটাই বুঝি মানুষের জন্ম ও জন্মান্তরের নিয়তি। বিশ্বকবি রবি ঠাকুরের জীবনেও দুঃখের কোনো সীমা ছিল না। কারণ তাঁর বেঁচে থাকা অবস্থায় তাঁর প্রিয় আদরের সন্তানেরা সকলেই ধরাধাম ত্যাগ করে। আর জাতীয় কবি নজরুলের অপর নাম ছিল দুখু মিয়া। তাঁর সারাজীবন কেটেছে অভাব-অনটন, দারিদ্র্য ও প্রতিকূল পরিবেশের সাথে লড়াই করে। তিনি একটি কবিতায় গো-বাক তরু (সুপারি গাছ) সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, তুমি যেমন কালবৈশাখী ঝড় বৃষ্টিতে দুমড়ে-মুচড়ে যাও তেমনি আমি সকল প্রকার দুঃখ, অবসাদ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজের মধ্যে আন্দোলিত ও উদ্বেলিত হই। অন্যদিকে রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর নিজের পারিবারিক অভাব-অনটন, ডায়াবেটিক রোগ, দুঃখ অবসাদ ও বিভিন্ন সমস্যার কারণে অসচেতনভাবে পথ চলতে গিয়ে কলকাতার ধীর গতির ট্রামের নিচে চাপা পড়ে অবিশ্বাস্যভাবে ইহলোকের সাঙ্গ ত্যাগ করেন!

গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিস অনেক আগেই বলে গিয়েছেন যে, 'নিজেকে জানো'। বিখ্যাত এই উক্তির অনেক ধরনের ব্যাখ্যা প্রচলিত রয়েছে। এই প্রবন্ধের শিরোনাম ও বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতার উপর এটা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, সুস্থ ও সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য প্রতিটি মানুষকে নিজের ভালো-মন্দ, গুণাবলি ও নিজের দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জানতে হয় এবং এদের যত্ন ও পরিচর্যা করতে হয়।

অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গানে কবি, মরমি বাউল ও দেহতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক সাধকেরা আমাদের এই মানব দেহকে কখনো ঘড়ি আবার কখনো গাড়ির সাথে ভাবগত, দেহ-তত্ত্বগত কিংবা রূপক, উপমা ও প্রতীকী অর্থে তুলনা করে আসছেন। যেমন–আবদুর রহমান বয়াতির গানে

বলা আছে ‘মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করি... একখান চাবি মাইরা, দিছে ছাইড়া, জনম ভইরা চলতে আছে।’ বাংলাদেশের ভাটি অঞ্চলের প্রয়াত মরমি বাউল কবি ও শিল্পী শাহ্ আব্দুল করিম কথায় ও সুরে বলে গেছেন, ‘গাড়ি চলে না, চলে না, চলে না রে, গাড়ি চলে না, মহাজনে যতন করে, তেল দিয়াছে টাংকি ভরে, গাড়ি চালায় মন ড্রাইভারে, ভালো-মন্দ বোঝে না।’ আবারও ওপার বাংলার জনপ্রিয় শিল্পী পবন দাস বাউলের গানের মাধমে মানব গাড়ির বর্ণনা সত্যিই আসাধারণ। ‘ইঞ্জিনেরই আগুনের কল, গাড়ির কত বল, গাড়ি থেকে বেরুলো নারী, দৌড়োদৌড়ি হুড়োহুড়ি, দুই গাড়িতে ধাক্কা লেগে, কত মানুষ গেল রসাতল, এ গাড়ির সাহেব ৬ জনা, ময়লা টানা এরাই ২ জনা।’

মানব দেহ কোনো যান্ত্রিক রোবট নয়। মানুষের মস্তিষ্কের যে কার্যক্ষমতা তার প্রায় এক লাখের মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ কার্যক্ষমতা দিয়ে একটি রোবট বানানো হয়েছে। বাইবেল মতে, মানুষ রক্ত মাংসে গড়া দুর্বল চিত্ত সম্পন্ন জীব। আর তাই তো মানুষ মিথ্যাবাদী রাখালের গল্পের মতো আত্মঘাতী ও আত্মপ্রবঞ্চনামূলক নিছক সাময়িক কিংবা লোক-দেখানো বা লোক-ঠকানো বিনোদনের জন্য জাদুকরী ও মায়াবী মাদক ও অন্যান্য রকমারি ও বাহারি নেশা জাতীয় দ্রব্যের কাছে মায়াবী এক দুর্বার আকর্ষণে নিজের অজান্তেই বারবার ফিরে আসে এবং নিজেকে আত্মসমর্পণ করে।

মানব দেহ মূলত নিয়ন্ত্রণ করে সৃষ্টিকুলে শ্রেষ্ঠ মানুষের উর্বর মস্তিষ্ক, হৃদয় ও মন। মানুষের প্রত্যক্ষ স্পর্শ ছাড়া যেমন কোনো যান্ত্রিক কোনো কিছু চলতে পারে না, তেমনি মানব দেহের পঞ্চেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও মনের সুষম সমন্বয় ছাড়া এই মানব দেহ সঠিক পথে চলতে পারে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, মানুষের মানবিক গুণাবলি, সুকুমার প্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণের যখন ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটে না তখনই যাবতীয় নেতিবাচক প্রলোভন, শয়তানের প্ররোচনা, কুপ্রবৃত্তি মানব দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গে প্রভাবিত করে এবং মানুষের বিভিন্ন অন্ত্র-তন্ত্রে ঘুণে ধরে। মানব দেহের আট কুঠরি ও নয় দরজা যেমন–লিভার, কিডনি এবং মস্তিষ্কসহ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কার্যকারিতা ক্রমেই লোপ পেয়ে একদিন মানব দেহ নিথর ও নির্জীব হয়ে যায়। নিজের প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের গগণ বিদারী আর্তনাদ ও হাহাকারে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। পৃথিবী নামক এই ভূস্বর্গ থেকে ক্রমান্বয়ে এক একটি নক্ষত্রের মর্মান্তিক যবনিকাপাত ঘটে!

প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে বেদনার নীল কাব্য

এই অপরূপ প্রকৃতির চির সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঘেরা বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি তীর্থভূমি। ভৌগোলিক আয়তনে ক্ষুদ্র অথচ জনসংখ্যার ঘনত্ব ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সারা বাংলাদেশে রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান যা পর্যটন এলাকা নামে পরিচিত। এক একটি স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য একেক রকম বা অনন্য। অজানাকে জানার এবং অদেখাকে দেখার অদম্য কৌতূহল মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

'বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপরে, একটি শিশির বিন্দু।'

ছোট্ট সত্যজিৎ রায়কে লিখে উপহার দেয়া উপরের কবিতায় কবিগুরু তাঁর মাকে আরও বলেছেন যে, 'এটার মানে ও আরেকটু বড় হলে বুঝবে।' আজ বয়সে একটু বড় হয়ে এই কবিতার অর্থ খুঁজতে গিয়ে আমার মধ্যেই এক নতুন চেতনার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের চারিপাশে যে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে কিংবা ধানের শিষের উপর সকালের শ্বেত শুভ্র শিশিরবিন্দু রয়েছে তাঁর সৌন্দর্য আমাদের অনেকেরই চোখে পড়ে না। এজন্য আমরা জীবনের অনেক সময় ও অর্থ খরচ করে দেশ-বিদেশের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি এই বিশাল প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ ও বর্ণ আস্বাদনের জন্য এবং বিনিময়ে প্রকৃতি কখনও আমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেয় না। আমরা এই প্রকৃতির উদার নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও বিমোহিত হই। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে অনেক দর্শনীয় স্থান ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রয়েছে যার শারীরিক সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি, দুই নয়নের দৃষ্টিতে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকি এবং আমাদের শ্রম ও অর্থ

খরচ করা সফল ও সার্থক হয়েছে বলে আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। অথচ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে যে কত অসংখ্য মানুষের অজানা দুঃখ, হাহাকার, দীর্ঘশ্বাস, চোখের নোনা জলের অশ্রুবিন্দু ও বেদনার নীল কাব্য লুকিয়ে আছে তা উদঘাটন করাই আমার এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের কর্ণফুলী কাপ্তাই লেক : পাহাড়ি আদিবাসীদের দুঃখ গাথা

প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি রাঙামাটি পার্বত্য জেলা। পাহাড়, নদী ও লেকবেষ্টিত দেশের বৈচিত্র্যময় জনপদ এটি। সুউচ্চ পাহাড়, সবুজ বনানী, ঘন মেঘ-মল্লার দল, বাহারি রঙের আকাশ, দুর্গম অরণ্য ঘেরা হাজারো ঝরনা ধারায় বেঁচে থাকা পাহাড়–সব মিলিয়ে প্রকৃতির অপরূপ সুন্দর রাঙামাটি। ষাটের দশকে পাকিস্তান সরকার এবং দাতা সংস্থা ইউএসএইড (USAID)-এর সহায়তায় নির্মাণ শুরু হয় কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে একটি সমন্বিত প্রকল্পের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই বাঁধ নির্মাণে ঠিকাদার কোম্পানি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রের 'উটাহ ইন্ট্যারন্যাশনাল ইনকর্পোরেশন' নামক প্রতিষ্ঠানকে। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে বাঁধ নির্মাণের মূল কাজ শুরু হয় এবং ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে কাজ শেষ হয়। এই বাঁধ তৈরির সময় ৬৫৫ বর্গকিলোমিটারে এলাকা প্লাবিত হয়, যার মধ্যে ছিল ২২ হাজার একর চাষাবাদযোগ্য জমি। কাপ্তাই লেক নির্মাণে প্রায় ১৮ হাজার মানুষের ঘরবাড়ি বিলুপ্ত হয়েছে, প্রায় ১ লক্ষ মানুষকে তাদের আবাসভূমি থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই চাকমা জনপদের মানুষজন। এই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট। অথচ কী নিষ্ঠুর পরিহাস, বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ২৫ মেগাওয়াট এবং দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এর অবদান খুবই সামান্য। কাপ্তাই লেক বর্তমানে একটি জনপ্রিয় পর্যটন বিনোদন কেন্দ্র যা নীরবে-নিভৃতে পাহাড়ি আদিবাসীদের নিদারুণ উচ্ছেদ ও দুঃখ গাথার কথাই বলে যায় প্রতিনিয়ত!

ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীরে এখনও সহিংস ও রক্তাক্ত বিদ্রোহ

রোমান্টিক স্বপ্নের ভূস্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীর যেন এক স্বপ্নরাজ্য। সবুজে সবুজে উদ্ভাসিত কাশ্মীর, উইলো গাছের সারিবদ্ধ রাস্তা, সবুজ শস্যক্ষেত, সবুজ গাছের ফাঁকে নীল আকাশ আর দূরে রুক্ষ পাহাড় ও নিশ্চুপ উপত্যকা। গোলাপি, সাদা রঙের সরষে আর পপি ফুলে সারা গ্রীষ্ম ঝলমল করে সমগ্র

উপত্যকা। জাফরান চিনারের রং বদলানো মনোরম দৃশ্য। আর শীতে তো রয়েছেই বরফ চাদরে মোড়া সারা উপত্যকা। রহস্যময়ী জম্মু ও কাশ্মীরের নৈসর্গিক রূপবৈচিত্র্য সব পর্যটকের কাছে ভূস্বর্গের এক অনন্য চিত্র। এ যেন প্রভুর হাতে গড়া সুন্দর, মনোরম আর নয়ন জুড়ানো ভুবন ভুলানো এক নান্দনিক দৃশ্য।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চতুর্দশ শতাব্দী থেকে জম্মু ও কাশ্মীর যথাক্রমে ইউসুফ চক ও মুঘলদের শাসনে ছিল। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জম্মু ও কাশ্মীর শিখদের দখলে আসে। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় জম্মু ও কাশ্মীরের শিখ মহারাজা হরি সিংকে তিনটি প্রস্তাব দেয়া হয়। যথাক্রমে–১) স্বাধীন থাকার ২) ইন্ডিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার ৩) পাকিস্তানের সাথে যোগ দেবার। তখন মুসলমান জনগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কেননা মহারাজা হয়তো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে চাইবে এই আশঙ্কায়। তাই তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের সহায়তায় জম্মু ও কাশ্মীর দখল করার জন্য আক্রমণ করে। মহারাজা যখন দেখলেন তাদের সাথে যুদ্ধে পেরে উঠবেন না, তখন তিনি ভারতীয় আর্মির সাহায্য চান। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নেহরু বলেন, যদি জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের অংশ করা হয় শুধুমাত্র সেই শর্তে ভারত মহারাজাকে সাহায্য করবে। মহারাজা তখন বাধ্য হয়ে এই শর্তে রাজি হন। সেই সাথে শুরু হয় কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধ এবং ভূ-স্বর্গ জম্মু ও কাশ্মীর জনগণের দুঃখের দিন ও সংঘাতময় যুগের সূত্রপাত। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারত-শাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে চলেছে তীব্র সহিংস ও রক্তাক্ত বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা।

১৯৪৭ পরবর্তীকালে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ নামে পরিচিত এক আইন অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা, নিজেদের সংবিধান ও একটি আলাদা পতাকার অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু তাঁদের ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ভারতের ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার ২০১৯ সালের ৫ই অগাস্ট জম্মু ও কাশ্মীরের সেই বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা বাতিল করে। পূর্বের স্বায়ত্তশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য পুরোপুরি মুছে ফেলে একে রূপান্তর করা হয় লাদাখ এবং জম্মু-কাশ্মীর নামে দুটি পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে। আজও ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হওয়া জম্মু ও কাশ্মীরের সেই বিভক্তি জোড়া লাগেনি এবং মানুষের মনে দানা বাঁধা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, হতাশা, অশান্তি এবং হৃদয়ের ক্ষত এখনও সারেনি!

পৃথিবীর স্বর্গ সুইজারল্যান্ডে কালো টাকার সুইস ব্যাংক ও আত্মহত্যার বৈধতা

পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গ সুইজারল্যান্ড যেন প্রকৃতির অমায়িক রহস্যের বিশাল এক ভাণ্ডার, শ্বেতশুভ্র বরফের রাজ্য বরাবরই প্রকৃতিপ্রেমীদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বত অন্যতম। সেখানে প্রাকৃতিকভাবে গঠিত বরফের গুহা পর্যটকদের বিমোহিত করে। আয়তনে ছোট হলেও দেশটি সব দিক দিয়েই ইউরোপের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে। কারণ দেশটি অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অন্যতম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

সুইজারল্যান্ড সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময়, সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা এবং প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র রয়েছে যেখানে প্রতিবছর রাষ্ট্রপতি পরিবর্তন হয়। জোট নিরপেক্ষ দেশটির কোনো নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই এবং সেখানে রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ জীবনযাত্রার মান। এতকিছুর পরও সুইস ব্যাংকসমূহ সারা বিশ্বের কালো টাকা নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য কুখ্যাত। সুইস ব্যাংকসমূহ গ্রাহকের গোপনীয়তা কঠোরভাবে বজায় রাখে। ফলে সারা বিশ্ব থেকে অপরাধীরা দুর্নীতির কালো টাকা সেখানে অনায়াসে জমা রাখতে পারে। যুক্তরাজ্যের লন্ডন ভিত্তিক ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক (Tax Justice Network) বলেছে, সুইস ব্যাংকের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ২১ বিলিয়ন বা ২ হাজার ১০০ কোটি ডলার কর থেকে বঞ্চিত হয়। ইদানীং কালে আবার পানামা, বাহামা, কেইম্যান আইল্যান্ড বা ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডের মতো 'করস্বর্গ' এখন সুইস ব্যাংকের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই এ নিয়ে দেশটির প্রতি সারা বিশ্বের জনগণের অসন্তোষের কোনো সীমা নেই!

সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে আরও একটি বিস্ময় হচ্ছে যে, আত্মহত্যা যেখানে মহাপাপ সেখানে দেশটির সরকার আত্মহত্যায় সহায়তা প্রদান করাকে আইনিভাবে বৈধতা দিয়েছে। সুইজারল্যান্ডের ডিগনিটাস (Dignitas) এবং এগজিট ইন্টারন্যাশনাল (Exit International) নামক সংস্থা দুটি এই বিষয়ে কাজ করে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করতে চায় তাহলে জুরিখে গিয়ে এক মিনিটেরও কম সময়ে ব্যথা-বেদনাবিহীন অনায়াস মৃত্যু বেছে নিতে পারে। সম্প্রতি এই সংস্থার দুটির কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন বিভিন্ন দেশের আইনজীবীরা। এ নিয়ে অবশ্য দেশটির সরকার ও প্রশাসন এখন বড়ই অস্বস্তিতে রয়েছে। তাই এ জন্য বলা হয় পৃথিবীর বুকে এক টুকরো স্বর্গ সুইজারল্যান্ডে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে বেদনার নীল কাব্য!

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর)-এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপ্স হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতাস এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি লাভ করেন এবং Flinders University of South Australia থেকে Masters of Policy and Administration ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১০-২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়ে Flinders University of South Australia থেকে Public Policy and Management এর উপর PhD ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্রাক ও সুপ্র সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থায় দক্ষতার সাথে কাজ করেন এবং অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার কানেকটিকাট রাজ্য সরকারের সমাজ সেবা বিভাগে কর্মরত আছেন।

Boichitro O Shompritir Bangladesh
by Lawrence Besra
Price : 350/- US: $ 20
ISBN : 978-984-8054-36-9

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ • লরেন্স বেসরা

লরেন্স বেসরা

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ■ চারু পিন্টু

লরেন্স বেসরা ১৯৭৫ সালের ৮ই মে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার হাজিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত নিজ গ্রামের হাজিপুর আদিবাসী প্রাইমারী স্কুলে পড়াশুনা করেন যা স্থানীয় বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর) এবং কারিতাস দিনাজপুর আঞ্চলিক অফিস এর আওতায় "অবহেলিত শিশু শিক্ষা প্রকল্প" এর অধীনে পরিচালিত হতো। তিনি ১৯৮৬-৮৮ সাল পর্যন্ত বলদিপুকুর ক্যাথলিক মিশন (মিঠাপুকুর, রংপুর)-এর বোর্ডিং-এ থেকে বলদিপুকুর হাইস্কুল এ পড়াশুনা করেন এবং ১৯৮৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৯১ সালে দিনাজপুর-এর সেন্ট ফিলিপ্স হাইস্কুল থেকে এস এস সি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড-এর অধীনে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে দিনাজপুর সরকারী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স-মাস্টার্স সম্পন্ন করার পর ২০০২ সালে বাংলাদেশ কারিতাস এর প্রধান অফিস ঢাকাতে আদিবাসীদের জন্য আই সি ডি পি প্রকল্পে প্রোগ্রাম অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। ২০০৩-২০০৫ সালে তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি লাভ করেন এবং Flinders University of South Australia থেকে Masters of Policy and Administration ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ২০১০-২০১৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের বৃত্তি নিয়ে Flinders University of South Australia থেকে Public Policy and Management এর উপর PhD ডিগ্রী অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, ব্রাক ও সুপ্র সহ একাধিক বেসরকারি সংস্থায় দক্ষতার সাথে কাজ করেন এবং অনেক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকার কানেকটিকাট রাজ্য সরকারের সমাজ সেবা বিভাগে কর্মরত আছেন।

Boichitro O Shompritir Bangladesh
by Lawrence Besra
Price : 350/- US: $ 20
ISBN : 978-984-8054-36-9

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ • লরেন্স বেসরা

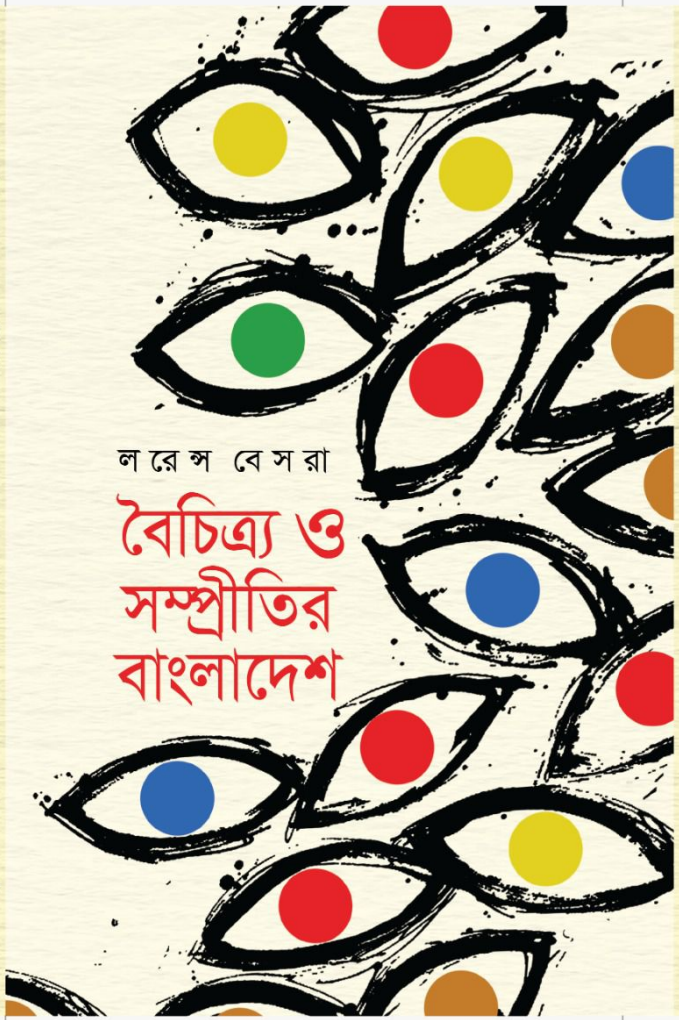

লরেন্স বেসরা

বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ ■ চারু পিন্টু